শ্রাদ্ধিকী

অর্থাৎ

শ্রাদ্ধবাসরে বিবৃত কতিপয় সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

শ্রীকামিনী রায় বি, এ প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীসুধীরকুমার সেন বি, এ।

কলিকাতা।

ইংরাজী ১৯১৩।

ভূমিকা

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে লেখিকার জীবনের উপর দিয়া বার বার মৃত্যু ও শোকের ঝটিকা প্লাবন বহিয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধবাসরে শোকাশ্রু মুছিতে মুছিতে বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পরলোকগত প্রিয়জনের গুণ স্মরণ ও বর্ণনের ভার একাধিকবার এই অযোগ্য জনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই কর্ত্তব্য করিতে গিয়া শোকের বেদনা কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যের স্মৃতি এক শান্ত প্রীতির ধারায় সন্তপ্ত চিত্ত সিক্ত করিয়াছে।

সর্ব্ব প্রথমে স্বামীর অনুরোধ ক্রমে প্রিয়তমা কন্যা সরযূর জীবন, দূরস্থ ও নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির ন্যায়, লিখিয়া দিই। উহা সঞ্জীবনী পত্রিকায় :প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর স্নেহাস্পদ ভ্রাতা যতীন্দ্র মোহনের এবং তৎপর পূজ্যপাদ পিতৃদেবের এবং, অবশেষে, জীবন পথের সহযাত্রী যাঁহাকে পাইয়াছিলাম, তাঁহারও শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিতে হইল।

পিতৃদেবের জীবনের সমুদয় ঘটনা সংগ্রহ করিয়া একখানি বিস্তৃত জীবন চরিত লিখিবার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া, বন্ধুগণের অনুরোধ সত্ত্বেও শ্রাদ্ধ বাসরে পঠিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ তৎকালে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও বন্ধুগণের মধ্যে বিতরিত হয় নাই। কিন্তু প্রায় পাঁচ বৎসর কাল অতীত হইয়া গেল, অথচ অভীষ্ট সিদ্ধির দিকে একটুও অগ্রসর হইতে পারি নাই। এদিকে তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ কোন কোন পুরাতন বন্ধু ও বর্ত্তমান কালের অনেক যুবক তাঁহার জীবনের কথা জানিবার জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইতেছেন। তাঁহাদের

জন্য এবং বিশেষ ভাবে আমার পিতৃপরিবারের ও আমার নিজের সন্তানগণের জন্য, ঐ সংক্ষিপ্ত বিবরণই মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই। উহা যন্ত্রস্থ হইবার পরে ক্রমে অন্যান্য জীবনগুলিও দিতে ইচ্ছা হইল। মনে হইল, সন্তান গণের অভিভাবকরূপে তাহাদের জন্য তাহাদের পৈত্রিক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছি ; তাহাদের অপর যে বহুমূল্য উত্তরাধিকার রহিয়াছে, তাহাও রক্ষা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। এই জন্য আমার পিতা ও ভ্রাতার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্তের সঙ্গে তাহাদের পিতা ও ভগিনীর জীবনকথা গ্রথিত করিয়া দিলাম।

বলা বাহুল্য যে, আমার স্বামীর ঘটনাবহুল জীবনের সম্পূর্ণতর কাহিনী, তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর পরে, চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে লিখিয়া উঠা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই বেদনাবিমূঢ় অবস্থায় কোন প্রকারে জীবনের স্থূল কথাগুলি লিপিবদ্ধ হইয়া শ্রাদ্ধবাসরে উপাসনান্তে পাঠ করিবার জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে অর্পিত হয়, তিনিই উহা পাঠ করেন। উহার আরম্ভভাগ আমার ভগিনী সংকলন করেন। পিতৃদেবের চরিতের প্রথমাংশটুকুও তাঁহার রচনা।

সম্প্রতি বিবরণগুলি পুরাতন পত্রিকাদি হইতে উদ্ধরণ কালে আবশ্যক বোধে দুই এক স্থলে সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন সাধিত হইল।

গ্রথিত চরিত্রগুলি দুই ভিন্ন পরিবারের হইলেও মৎসূত্রে ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এই দুই পরিবারের কথা আমার সন্তানগণের অতি আপন ও অতি প্রিয়। আশা করি তাহাদের ভবিষ্যদ্ গৃহে ও ভবিষ্যদ্ বংশেও ইহা চিরদিন আদৃত হইবে। কিন্তু এই পুস্তিকা, এই নির্দ্দিষ্ট পরিধির বাহিরে গিয়া, যে সর্ব্বাংশে সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে, তাহা আশা করিতে পারি না।

কোনও সময়ে হয়তো কাহারও কাছে এই ক্ষুদ্র বিবরণগুলি বড়ই অপূর্ণ মনে হইবে ; দোষের কথার উল্লেখ নাই বলিয়া, এগুলি অর্দ্ধ সত্য

বলিয়া সন্দেহ জন্মিবে। তখন মনে রাখিতে হইবে, যে, এগুলি লোকান্তরিত প্রিয়জনের উদ্দেশে শ্রদ্ধার অঞ্জলিমাত্র। যাঁহারা আমাদের কাছে আর কিছুরই ভিখারী নহেন, যাঁহারা আমাদের সেবা ও পরিচর্য্যার অতীত স্থানে পৌছিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দিবার জন্যই আমরা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করি। সেদিন কাহারও জীবনের দোষ, ত্রুটি বা অপরাধের হিসাব লইবার দিন নহে। মানুষ যখন অপূর্ণ, তখন তাহার জীবনে ত্রুটি থাকিবেই থাকিবে; কিন্তু সেগুলি সাধারণের নিকট বা বংশধরগণের নিকট বিবৃত করিয়া কোন ফল নাই। যাহা সুন্দর, যাহা মহৎ তাহারই জ্ঞানে ও চিন্তনে আনন্দ।

আরও একটি কথা। মৃত্যু যখন প্রিয়জনকে কাড়িয়া লয়, তখনই, জীবন হইতে কতখানি প্রেম, কতখানি আনন্দ হারাইলাম, একবার ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। চরিত্রের যে মহত্ত্ব, যে সৌন্দর্য্য, হৃদয়ের যে প্রীতি ও সহানুভূতি, আত্মত্যাগের কঠোরতার সহিত আত্মবিস্মৃতির যে অপূর্ব্ব মধুরতা, অতি নৈকট্যবশতঃ দেখিয়াও দেখি নাই, নিত্য ব্যবহৃত বস্তুর ন্যায় যাহা বড়ই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, মৃত্যুর বিদ্যুতালোকে শোকাশ্রুর ভিতর দিয়া, তাহা আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়। এই জন্য বিচ্ছেদও শোকের মধ্যেই আমরা প্রিয়জনের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া চিনিয়া লই। জীবনে তাঁহাদিগকে পদে পদে অবিচার করিয়া, মৃত্যুর পর অনুতাপ, অশ্রুপাত ও গুণ স্মরণ দ্বারা কৃত অপরাধের কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করি।

জীবনের আদর্শে জীবন গড়িয়া উঠে। উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্য চরিত্র ভবিষ্যদ্বংশের নিজস্ব সম্পত্তি হউক, তাঁহাদের মহত্ত্বের ভিত্তির উপর ইহাদের সুন্দর সুদৃঢ় জীবন-সৌধ উত্থিত হউক, এবং কেবল ইহাদের মধ্যে নহে, কেবল দুই একটি পরিবারে নহে, বহু পরিবারে, বহু দূরে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই সকল চরিত্রের

সৌন্দর্য্য ও কল্যাণকর প্রভাব বিস্তীর্ণ হউক, সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।

হাজারিবাগ,
১লা বৈশাখ ১৩১৯
১৪ই এপ্রিল ১৯১২।

শ্রীকামিনী রায়

শ্রাদ্ধিকী।



স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন।

ইংরাজী ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারীর শেষভাগে, বাঙ্গালা ১২৫১ সনের মাঘী সপ্তমীর দিনে*বাখরগঞ্জ জেলার বাসণ্ডা গ্রামে, বৈদ্যকুলে, এক শাক্ত পরিবারে আমার পিতৃদেব চণ্ডীচরণ সেনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নিমচাঁদ সেন ও তাঁহার মাতার নাম গৌরী ছিল। তাঁহার পিতামহ রামরতন সেন ধনশালী ছিলেন না। ভাবী বংশধরগণের জন্য তিনি ধন সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্রগত ধর্ম্মনিষ্ঠা জিতেন্দ্রিয়তা, নিঃস্বার্থতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উত্তরাধিকার তিনি তাঁহাদিগকে দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কখনও কাহারও চাকরী করেন নাই, সামান্য পৈত্রিক সম্পত্তি দ্বারাই তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতার পরিবার প্রতিপালন হইত। তাঁহাদের ভূসম্পত্তির বার্ষিক আয় ১৫০৲ টাকার অধিক ছিলনা, তাহাও নগদ ১৫০৲ টাকা নহে। জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ধান্যাদি ও তদ্ব্যতীত ৬০।৭০৲ টাকা নগদ প্রজাদিগের নিকট হইতে পাইতেন। পরিবারস্থ সকলের পরিধেয়, রন্ধনার্থ লবণ তৈল ঘৃত ইত্যাদি এই টাকার দ্বারা ক্রয় হইত। বসত বাটীর বৃক্ষাদি হইতে কাষ্ঠ, পুষ্করিণী অথবা গ্রামস্থ ছোট ছোট নদী বা খাল হইতে মৎস্য, বাটী সংলগ্ন উদ্যান হইতে শাক সবজী ও ফলফল সংগৃহীত হইত। এখন

যাহা আয়াসলভ্য ও দুর্ম্মূল্য, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তাহা বিনামূল্যে ও অল্পায়াসে পাওয়া যাইত। এই জন্য শতাব্দী পূর্ব্বে পল্লীবাসী দরিদ্র ভদ্র পরিবারে যে শান্তি, সুনীতি ও স্বচ্ছন্দতা নিত্য বিরাজ করিত, বর্ত্তমান কালে তাহা কল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের পিতামহ দেব ও অতি নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। জপ তপঃ ব্রত উপবাস এবং তীর্থ পর্য্যটন তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। পিতামহী দেবীকে পিতা মহাশয় সর্ব্বদাই রমণীকুলের রত্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গৌরী দেবী প্রথম বয়সে অনেক গুলি শিশুসন্তান হারাইয়া ছিলেন; আমাদের পিতা চণ্ডীচরণ, তাঁহাদের শেষ বয়সের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান ও একমাত্র পুত্র। তাঁহাদের আর ও তিনটি কন্যা ছিলেন, তাঁহারা ইহাঁ হইতে বয়সে অনেক বড়। কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া তিনি অতি আদরের ধন ছিলেন। গৌরী দেবী ও তাঁহার স্বামীর দেবদেবীর প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি শোকতাপে আর ও গাঢ়তা লাভ করিয়াছিল। পুত্র কন্যাদিগের মঙ্গলোদ্দেশ্যে ইহাঁরা সর্ব্বদাই কঠিন ব্রত উপবাসাদি অনুষ্ঠান করিতেন। ইহাতেই পিতামহ দেবের লৌহবৎ কঠিন শরীর ও শেষ জীবনে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। পিতৃদেব জন্মিবার দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে পিতামহী দেবী দীর্ঘায়ুঃ পুত্র কামনা করিয়া, প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিতেন। তাহাতেই এই পুত্র জন্মিবা-মাত্র আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের স্ত্রীলোকেরা বলিলেন, চণ্ডীপাঠ শ্রবণের পুণ্যফলে আপনি পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন, অতএব পুত্রের নাম চণ্ডী চরণ রাখিবেন। তদনুসারে সদ্যপ্রসূত বালক চণ্ডীচরণ নাম প্রাপ্ত হইলেন। শৈশব কাল হইতে তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল ছিল, যে পিতা মাতা কখনও আশা করেন নাই যে তিনি দীর্ঘজীবী হইবেন। কোন অন্যায় কার্য্য করিতে অথবা কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিতে পিতামহী দেবী অত্যন্ত

ভীত হইতেন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে যদি কেহ কখন কোন কার্য্য সিদ্ধির জন্য মিথ্যা কথা বলিতে অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিতেন, আমার একটি মাত্র পুত্র, আমি কোন পাপ সঞ্চয় করিয়া ইহার অমঙ্গল করিব না।

পিতামাতার অতিরিক্ত আদর পাইয়া বালক চণ্ডীচরণ অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। গ্রামে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যেমন প্রশংসা ছিল, বালসুলভ চপলতার ও তদ্রূপ অখ্যাতি ছিল। কিন্তু পড়াশুনায় বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অনুরাগ ছিল, তাঁহার হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর ছিল। তিনি প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতেন, পরে ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য বরিশাল যাওয়া আবশ্যক হইল। পিতামহী দেবী বলিলেন একমাত্র পুত্র দূরে পাঠাইয়া শূন্য গৃহে কিরূপে থাকিব? গৃহে একটি বধু থাকিলে গৃহ আর শূন্য বোধ হইবে না বলিয়া, পিতামহদেব স্বগ্রামস্থ চন্দ্রমোহন দাস-মুন্সীব মহাশয়ের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। জননীর স্নেহ ভাগিনী বলিয়া এই বালিকাকে তাঁহার বালকস্বামী অতিশয় ঈর্ষ্যা করিতেন এবং সুবিধা পাইলে অত্যাচার করিতেও ছাড়িতেন না।* বাল্য বিবাহের অনেক কুফলের মধ্যে এই আর একটি কুফলের কথা পিতা মহাশয় প্রায়ই উল্লেখ করিতেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বরিশালের গবর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রেরিত হন; ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতৃ বিয়োগ ঘটে। অল্প বয়সে মাতৃহীন হইলেও তাঁহার হৃদয়ে মাতার স্মৃতি চির দিন উজ্জ্বল ছিল। পিতামহী দেবী ক্ষীণাঙ্গী ক্ষুদ্রাকৃতি ও গৌরবর্ণা ছিলেন, কোন বন্ধু পত্নীর এইরূপ চেহারা দেখিয়া পিতা মহাশয় তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মাতার কথা বলিতে হইলে, 'পূর্ণলক্ষ্মী, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা' ইত্যাদি উপমা ব্যবহার করিতেন।

১৮৫৭ হইতে ১৮৬৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি বরিশালে তাঁহার ভগিনীপতি আনন্দচন্দ্র সেনের বাসায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। এখানে তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্যে ভাল লোক কেহ ছিলেন না। সে সময়ে সুরাপানাদি কতকগুলি জঘন্য কার্য্য কেহ জঘন্য বলিয়া মনে করিতেন না, সুতরাং নীতি সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান এবং দুর্নীতির প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা, যাহা উত্তর কালে দেখা গিয়াছে, তাহা তখন ছিল কি না জানা যায় না।* কিন্তু জনক জননীর ভক্তিপ্রবণতা তাঁহাতে আশৈশব দৃষ্ট হইয়াছে। প্রাতঃ-কালে উঠিয়া প্রতিদিন দুর্গানাম জপ করিতেন, কোন স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে হইলে দুর্গানাম স্মরণ না করিয়া বাহির হইতেন না।* তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি, দুর্গা পূজাদি উপলক্ষে কেহ তাঁহাকে টাকা উপহার দিলে, তিনি তদ্দ্বারা দেবদেবীসম্বন্ধীয় পুস্তক ক্রয় করিতেন। এই সকল পুস্তকের অংশ বিশেষ সর্ব্বদা কণ্ঠস্থ করিতে ও পরে আবৃত্তি করিতে ভাল বাসিতেন।

স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যেই তৎকাল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের উপরে তাঁহার অনাস্থা উপস্থিত হইল। তৎকালে পূজনীয় রামতনু লাহিড়ী বরিশালে তাঁহার একজন শিক্ষক ছিলেন। শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি পুরাতন ব্রাহ্মগণ যখন বরিশালে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিতে ছিলেন, পিতা মহাশয় তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময় হইতেই তিনি ব্রাহ্মদিগের সহিত উৎসাহ সহকারে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। নির্ভীকচেতা সংস্কারক দুর্গামোহন দাসের সহিত বোধ হয় এই খানেই তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং বোধ হয় এই খানেই তাঁহাদের আমরণস্থায়ি সৌহার্দ্দ্যের সূত্রপাত হয়। দুর্গামোহন বাবু এই সময়ে বরিশালে ওকালতী আরম্ভ করিয়া ছিলেন।

১৮৬৩ সালে বরিশাল স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া,

এক বৎসর কলিকাতায় সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে উক্ত কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক Free Church Institution এ ভর্ত্তি হন। অতঃপর কতকটা শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ কতকটা অর্থাভাবে তাঁহাকে সে কলেজও ছাড়িয়া বাড়ী যাইতে হয়। তিনি কলিকাতা অবস্থান কালে দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠাগ্রজ, হাইকোর্টের উকীল কালী মোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া পড়িতেন এবং কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের সাহায্যে কলেজের বেতন চালাইতেন। কালী মোহন বাবুর বাসা হইতে পদব্রজে কলেজে যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল।*

কয়েক মাস স্বগ্রামে পিতার নিকট থাকিয়া তিনি ঢাকায় যাইয়া একটি বৃত্তি বা scholarship যোগাড় করিয়া, Lower Grade Pleadership পরীক্ষা দিবেন এই সংকল্প করিলেন। কিন্তু ঢাকায় আসিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ও scholarship পাইলেন না।

এই সময়ে তাঁহার একজন আত্মীয় কলিকাতায় তাঁহার জন্য একটা চাকরীর যোগাড় করেন। তাঁহার সে চাকরী লইবার ইচ্ছা ছিল না, কারণ তাহাতে অসৎ সংসর্গে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য যাহাতে ঢাকা থাকিয়া পড়িতে পারেন, অথচ কোন কাজ পাইতে পারেন তাহার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কোন মতেই কৃতকার্য্য না হইয়া, অবশেষে কলিকাতায় গিয়া পূর্ব্বোক্ত চাকরী লওয়াই স্থির করিলেন। কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, ষ্টীমার কোন সময়ে যাইবে জানিবার জন্য, নদীঘাটে উপস্থিত হইলেন, শুনিলেন সেদিন ষ্টীমার যাইবে না, অন্যমনস্ক ভাবে নদীঘাটে বেড়াইতে লাগিলেন, হঠাৎ লিবিংষ্টোন (Mr. Livingstone) সাহেবের বাড়ীর দিকে দৃষ্টি পড়িল। Livingstone সাহেব খুব ভদ্রও আলাপী লোক, শোনা ছিল; তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিয়া

আসিতে ইচ্ছা হইল। ইহার পূর্ব্বে ইহাঁদের মধ্যে কখন কথাবার্ত্তা হয় নাই। দুই চারি কথার পরই সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "আমি বাঙ্গালা শিখিতে চাই, আপনি যদি আমাকে শিখাইতে পারেন, আমি আপনাকে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতন দিতে প্রস্তুত আছি।" পিতা মহাশয় তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহার আর কলিকাতা যাইবার আবশ্যক হইল না, লিবিংষ্টোন সাহেবের সুপারিসিতে তাঁহার আর একটি স্থানে শিক্ষকতা (tutorship) জুটিয়া গেল। পিতা মহাশয় এই ঘটনাটিকে উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদাই পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন। উত্তরকালে ঘটনাটি তাঁহার নিকট পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ (direct intervention) বলিয়া মনে হইত। এই ঘটনা না ঘটিলে খুব সম্ভবতঃ তিনি কুসংসর্গে পড়িতেন এবং তাঁহার সংসারিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইত।* সেই সময়ে এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন,—"I have adopted a new course of life; I have accepted a private tuition. I was induced to accept this post rather from the desire of enjoying good company than from any love of money." "জীবনে এক নূতন পথ ধরিলাম, একটি শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিলাম। অর্থ লোভে নহে কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষায় এই কার্য্যে প্রণোদিত হইয়াছি।

ইংরাজীতে লিখিত তাঁহার দৈনন্দিন লিপি হইতে এই সময়ে তাঁহার প্রাত্যাহিক কার্য্যের নিম্নলিখিত তালিকা দেখা যায়।

Morning. Morning prayer, Study, Tuition and Prayer after bathing.

Noon. Study.

Afternoon, Tuition

Evening 7—7-30 Prayer.

Night. 8—12-30 Study

Study includes all secular and religious studies as well as attending the Law Class.

প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে এবং স্নানান্তে প্রার্থনার নিয়ম আজীবন রক্ষা করিয়াছেন। কেবল পাঠ্যাবস্থায়ই যে ১২টা ১২৷৷০টা রাত্রি জাগিয়া গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহা নহে, আমি বড় হইয়া ও তাঁহাকে মাঝে মাঝে এরূপ অধ্যয়নমগ্ন দেখিয়াছি।

১৮৬৭ হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঢাকা নগরীতে অবস্থান করেন। এই সময়ের দৈনন্দিন লিপি পাঠে জানা যায় যে তিনি দারিদ্রের কশাঘাতে বড়ই প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। কখনও বা দুই একটি Private tuition পাইতেন, কখনও আবার তাহা থাকিত না। লিভিংষ্টোন সাহেবের জন্য বাঙ্গালা পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াও কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি যে এই সময়ে কেবল আইন সম্বন্ধীয় পুস্তকই পড়িতেন তাহা নহে। জীবনী, ইতিহাস, দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক লাইব্রেরীতে যাহা পাইতেন, সকলই তিনি পড়িতেন। ১৮৬৮ সালে Lower Grade Pleadership ও ১৮৬৯ সনে Higher Grade Pleadership পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

এই সময়ে ঢাকাস্থ ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। পূজনীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। তাঁহার দৈনিক পুস্তকে দেখা যায়, এক রাত্রিতে তিনি বিজয় বাবুর সহিত একত্র সঙ্গীত ও উপাসনাদি করিয়াছেন, এই স্বপ্ন দেখিয়াও আনন্দ বোধ করিয়াছিলেন।

১৮৭০ সনের ২৫শে মাঘ (৬ই ফেব্রুয়ারী) তিনি বিজয় বাবুর নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাকে ও

আর তিনজন যুবককে দীক্ষার্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই দীক্ষা দিনের সবিশেষ বর্ণনা তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে তাঁহার পিতৃদেব রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন। তাঁহার প্রকাশ্য ভাবে হিন্দুধর্ম্ম বর্জ্জন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সংবাদে রুগ্ন বৃদ্ধ জনক কিরূপ ব্যথিত হইবেন, এই চিন্তা দীক্ষাকালেও বারবার তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছিল। কিন্তু সেই দিনকার দৈনিক লিপিতেই তিনি লিখিয়াছেন, "যিনি পিতার পিতা এবং মাতার মাতা, যিনি দুঃখ বিপদ ও প্রলোভনে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমার যে বিশ্বাস তাহা কি পার্থিব পিতার অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে দিব?" দীক্ষার পর হইতে তিনি মনে অনেকটা শান্তি পাইয়া ছিলেন। অর্থকষ্ট আর পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। দীক্ষার পরদিনই তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন,—Early in the morning I got up from bed with a sense of great responsibility which had fallen upon me, owing to my having taken the vow (of দীক্ষা) on the preceding day. "প্রাতঃকালে একটা গুরুতর দায়িত্ব বোধ লইয়াই শয্যা হইতে উত্থান করিলাম। পূর্ব্বরাত্রে দীক্ষা কালে যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি ইহা তাহারই ফল।"

এই সময়ে আচার্য্য নির্ব্বাচন উপলক্ষে ব্রাহ্মদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হয়। পিতা মহাশয় ইহাতে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেতো অনেকবার এইরূপ হইয়াছে, কিন্তু তখন তাঁহার মনতো ব্যথিত হয় নাই এবার তবে কেন এমন হইল? এই প্রশ্নের মীমাংসা নিজেই করিয়াছেন। "Nothing is dear to us unless we purchase it at a good price. Religion is precious to us when we purchase it at the sacrifice of ties of blood". "যাহা অধিক মূল্য দিয়া

ক্রয় না করি, তাহা মূল্যবান জ্ঞান করি না, (তাহার আদর করি না)। ধর্ম্মের বিনিময়ে যখন রক্তের বন্ধন বিসর্জ্জন করিতে হয় (অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়) তখনই ধর্ম্ম আমাদের নিকট বহুমূল্য হয়।"

এখন তিনি সর্ব্বদাই উপাসনা, সভা, সঙ্গত, ব্রহ্মমন্দির—যেখানে পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তন হইত, সেই খানেই যাইতেন। প্রায়ই বিজয় বাবুর গৃহে উপাসনায় যোগদান করিতেন। এই সময়ে আত্মোন্নতির বিশেষ চেষ্টা ছিল; দারিদ্র ও দুর্ভাবনা কখনও বা কিছু অভিভূত করিত, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্রহ্মকৃপায় আবার পরমেশ্বরের উপর নির্ভরের ভাব আসিত। অনেক নূতন তত্ত্বলাভ ও নূতন ভাবের উন্মেষ এই সময়ে হয়। এক স্থানে লিখিয়াছেন "The religion, which has been purchased by the tears of my father, shall be strictly followed by me, at any cost and any sacrifice." "আমার পিতার অশ্রু দিয়া যে ধর্ম্ম ক্রয় করিয়াছি, সে ধর্ম্মের জন্য সকল কষ্ট, সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিব।"

ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার দীক্ষার সংবাদ তাঁহার পিতার কর্ণগোচর হইল। বৃদ্ধ রোগশয্যাশায়ী পিতা, পুত্রের হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগের সংবাদ পাইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। এই দুঃসংবাদ পুত্রের হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল, তখন সংকল্প করিলেন পিতাকে লইয়া সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিবেন। আত্মীয়বর্গ হইতে দূরে লইয়া গিয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার ব্যথিত হৃদয় শীতল করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি প্রাণপণে উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতী করিবেন এই অভিপ্রায়ে পারসী ও উর্দ্দু পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহার পিতার পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এদিকে ঢাকাতে আইন ব্যবসায়ের বড় সুবিধা হইতেছেনা, দেখিয়া, ১৮৭০ সালে, Higher Grade Pleadership উত্তীর্ণ হইবার কিছুদিন পরে, বরিশাল অসিলেন। পিতার ব্যাধি দুরারোগ্য ও মৃত্যু সন্নিকট মনে করিয়া, কিছু দিনের জন্য বাসণ্ডাগ্রামে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুকালে তথায় উপস্থিত থাকিলে পাছে কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়, সেই ভয়ে, সত্বর বরিশালে ফিরিয়া গেলেন।

১৮৭১ সনের ১৫ই জানুয়ারী পিতামহদেবের মৃত্যু হয়। পিতা মহাশয় স্বগ্রামে আসিয়া প্রচলিত রীতি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে, আমার মাতৃদেবী শ্বশুরের মুখাগ্নি হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্তই করিলেন। পিতামহাশয় বরিশালে থাকিয়া হবিষ্যের নিয়ম মাত্র পালন করিয়া, ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ করিলেন এবং হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহাকে নানা প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পাচক ও ভৃত্য তাঁহার চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিছু দিন পর্য্যন্ত তিনি ধোপা ও নাপিত পর্য্যন্ত পান নাই।

১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসে তিনি তাঁহার পত্নী ও শিশু কন্যা দ্বয়কে* আনিবার জন্য স্বগ্রাম বসণ্ডা গমন করেন। গ্রামস্থ লোকেরা সকলে মিলিয়া বলিলেন, আমরা বিধর্ম্মীর নৌকা ঘাটে লাগাইতে দিব না, স্ত্রীর সহিত দেখা না করিয়া ফিরিয়া যান, ভাল, নচেৎ নৌকা ডুবাইয়া দিব"। তাঁহারা মাতৃদেবীকেও নানাবিধ ভয় ও প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি উভয়ই অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার স্বামীর সহিত বরিশালে আসিলেন।

এই সময় হইতেই পিতা মহাশয়ের গৃহধর্ম্ম আরম্ভ হইল। তাঁহার গৃহে প্রতিদিনই ঈশ্বরের উপাসনা হইত। তিনি তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা

কন্যাকে একখানি "উপাসনা প্রণালী" দিয়া উপাসনা পদ্ধতি শিখাইতেন। তিনি শুদ্ধরূপে গান গাহিতে পারিতেন না তথাপি সঙ্গীত তঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। সর্ব্বদাই ব্যাকুল প্রাণে নিজের স্বরে গান ধরিতেন। গ্রাম হইতে আসিয়া "আমি হে তব কৃপার ভিখারী" এই নামটি প্রতিদিনই শুনিতাম। "ওহে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ"ও শুনিতাম। "যেন এরসনা করে হে ঘোষণা, সত্যের মহিমা জীবনে মরণে" বাবা খুব উৎসাহের সহিত গাহিতেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও তদনুরূপ উৎসাহে যোগ দিতাম। এই গানটি তাঁহার তত বেসুরা হইত না।

"নিত্য উপাসনা ইন্দ্রিয় দমন
পর উপকায় বৈরাগ্য সাধন"

এই কয়েকটি তিনি জীবনে নিয়তই সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন।

উকীল অবস্থায় তাঁহার দৈনিক পুস্তকে একদিকে যেমন আত্মানুসন্ধান ও আত্মোন্নতির চেষ্টা দেখা যায়, অপর দিকে সেইরূপ দারিদ্রের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের পরিচয় পাই। একদিন লিখিয়াছেন, "গত কয়েক মাসের আয়ব্যয় দেখিয়া মনে হয়, ভবিষ্যতে অনাহারে মরিতে হইবে। যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিত, আমি এতদিনে পাগল হইয়া যাইতাম। ভবিষ্যতে কি আছে জানিনা, তবে যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জীবনের নানা পরীক্ষায় আমায় উত্তীর্ণ করিয়া আনিয়াছেন, তিনি আমাকে কদাপি পরিত্যাগ করিবেন না"।

১৮৭৩ সনের মার্চ্চ মাসে বরিশালে একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ নিয়োগের আবশ্যক হয়। পিতা মহাশয়ও তাঁহার সমাবস্থ চারি পাঁচ জন নূতন উকীল ঐ কার্য্যের জন্য দরখাস্ত করেন। সকলেই তাঁহাদের বার্ষিক আয় ও বিদ্যার কথা লিখিয়াছিলেন। কেহ লিখিলেন বৎসরে ৬০০৲, কেহ ১২০০৲ কেহ ১৮০০৲। পিতা মহাশয় সমস্ত বৎসর যাহা

পাইয়াছেন, হিসাব করিয়া ঠিক তাহাই লিখিয়াছিলেন। উহা ১২ ভাগ করিলে মাসকরা অতি সামান্যই পড়ে। বিদ্যা সম্বন্ধেও সেইরূপ। অন্যেরা হিন্দী, উর্দ্দু, সংস্কৃত, ফারসী প্রভৃতি অনেক ভাষা জানেন বলিয়া লিখিলেন, পিতা মহাশয় তখন অল্প উর্দ্দু শিখিতেছিলেন, ঐ ভাষা জানেন লিখিলে তাঁহার সুবিধা হইবারই কথা, কিন্তু তিনি কেবল ইংরাজী ও বাঙ্গালার কথা লিখিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট জজ তাঁহার চরিত্রগুণে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন, এই আশ্চর্য্য সত্যবাদিতা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকেই মনোনয়ন করিলেন। ১৮৭৩ সনের মার্চ্চের ৩০শে তারিখ তিনি লিখিয়াছেন "আজ আমার জীবনের স্মরণীয় দিন, যদি ঈশ্বর করেন, ইহা স্মরণীয় দিন হইবে। "If god would make it such." ইহার মধ্যে তাঁহার বিশ্বস্ত হৃদয় খানি প্রতিফলিত রহিয়াছে।

২১শে মার্চ্চ তারিখ তিনি বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে পিরোজপুরের মুন্সেফ হইয়া যাইতে হয়। ৩১শে মে সেখানে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, আর ৮ই জুন তথায় ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতি রবিবার তাঁহার বৈঠকখানায় আহুত ও সমাগত ভদ্রলোক দিগকে লইয়া উপাসনা হইত।

২৮শে জুন লিখিয়াছেন, "আমার অধ্যয়নে অবহেলা হইতেছে। প্রতিজ্ঞা করিলাম, এখন হইতে আবার রীতিমত পড়াশুনা করিব। সকালে দর্শন শাস্ত্র, বিকালে আইন এবং রাত্রে রাজনৈতিক বিষয় পাঠ করিব।"

পিরোজপুরের কাজ হইতে অবসর পাইয়া, পিতা মহাশয় আবার বরিশালে আসিলেন। তাঁহার বন্ধু ও মুরুব্বি Mr. Morris তখন হাইকোর্টের আসিয়াছেন এবং Mr. Tottenham বরিশালের জজ হইয়াছেন, ইনিও পিতৃদেবের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, ইহাঁর সুপারিস পত্রাদি

লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। এই সময়ে অভাব ও ভবিষ্যতের ভাবনা সত্ত্বে ও ধর্ম্মসংস্কারের চিন্তা ও চেষ্টার বিরাম ছিল না।

কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুর গাঁয়ে একটি মুন্সেফি পাইলেন। তখন পরিবার ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "ভারতাশ্রমে" রাখিয়া একাকী কার্য্য স্থানে গেলেন। তাঁহার ধর্ম্মগুরু ও বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তৎকালে "ভারতাশ্রমে" ছিলেন। এই স্থানে অন্যান্য প্রচারকদিগের সহিত পিতা মহাশয়ের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল।

১৮৭৪ সনের মে মাসে পিতৃদেব স্থায়ী মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়া ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর যান। হরিনাভিতে তখন পূজনীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শিক্ষকতা কার্য্য করিতেন, এই সময়ে তাঁহার সহিত পিতৃদেবের পরিচয় ও বন্ধুত্ব জন্মে।

বারুইপুর হইতে তিনি পাবনা জেলার মহকুমা সাহাজাদপুর বদলী হন। এই স্থানে যাইবার পূর্ব্বে ১৮৭৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা আসিয়া জেষ্ঠা কন্যাকে মিস এক্রয়েড প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমহিলা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া যান।

সাহাজাদ পুরে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। তাঁহার মোহরের নাজির পদপ্রার্থী হইলে পর, health cetificate এর জন্য তাহাকে পাবনার সিবিল সার্জ্জনের নিকট যাইতে হয়। উক্ত সিবিল সার্জ্জন প্রথমতঃ স্বাস্থ্য ভাল নয় বলিয়া ঐ ব্যক্তিকে certificate দিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু কিছু ঘুষ পাইয়া পরে certificate দেন। পিতা মহাশয় এই অবৈধ কার্য্যের কথা জানিতে পারিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, ডিষ্ট্রিক্ট জজের নিকট উত্তেজিতভাবে এই কার্য্যের কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। হিতে বিপরীত হইল। যে অন্যায় করিয়াছে

তাহার কিছুই হইল না, পরন্তু একজন সামান্য মুন্সেফ, জজ সাহেবের বন্ধু ও স্বজাতীয়, উচ্চ বেতন ধারী ডাক্তারকে এমন গুরুতর অপরাধে অপরাধী করিতেছে এই আস্পর্দ্ধা জজের অসহ্য হইল। তিনি পিতা মহাশয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং মিথ্যা অভিযোগের দায়ে যাহাতে তিনি গুরুতর শাস্তি পান তাহা করিলেন। যেব্যক্তি ঘুষ দিয়াছিলেন তিনি নিজে এবং সাহাজাদপুরের অন্য মুন্সেফ জজের ভয়ে, অথবা প্রীতিকামনায়, পূর্ব্বে পিতা মহাশয়কে যাহা বলিয়াছিলেন সমুদয় অস্বীকার করিয়া বসিলেন। এই সময়ের দৈনিক বিবরণ খুজিয়া পাই নাই, কিন্তু এইসময়টি যে তাহার বিশেষ সঙ্কট ও দুশ্চিন্তার সময় ছিল, তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, কারণ ইহার জন্য তাঁহাকে কলিকাতা আসিতে হয়। সেই বাল্যকালের কথা যতটুকু স্মরণ হয়, তাহাতে এই ধারণা জন্মিয়াছে, যে, তাঁহার পূর্ব্ব বন্ধু Justice Morris প্রভৃতির অনুগ্রহেই তাঁহার চাকরী বজায় রহিল, তিনি কেবল তিরস্কৃত ও স্থানান্তরিত হইলেন।

অতঃপর মাণিকগঞ্জে আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি উকীল দিগের মধ্যে ব্যবসায়গত দুর্নীতি দেখিতে পাইলেন এবং শাস্তি দ্বারা এই দুর্নীতির সংশোধনের জন্য (to make an example) একজন উকীলের ওকালতী ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিলেন, অর্থাৎ তাহাকে disbar করিলেন। এই কার্য্য দ্বারা তিনি অনেকের বিদ্বেষ ভাজন হইয়াছিলেন। এই খানেই প্রথম ভিক্ষা ব্যবসায়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দূষিত জীবনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। শ্রমক্ষম অথচ শ্রম-বিমুখ, ধর্ম্মের নামে দুর্নীতিপরায়ণ, কদাচারী এই শ্রেণীর লোককে যাহাতে ভিক্ষা দিয়া প্রশ্রয় দেওয়া না হয়, তদর্থে একখানি মুদ্রিত পত্র বাহির করিলেন এবং নিজের বাটীতে বৃদ্ধ রুগ্ন ভগ্ন বা অসমর্থ ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও ভিক্ষা দেওয়া হইবে না, এই নিয়ম করিলেন। এই স্থানে অবস্থান কালে ভদ্রনামধারী অনেকে তাঁহার

প্রতি বিরক্ত হইলেও দেশের প্রজাসাধারণ তাঁহার সদ্বিচারের নিয়ত প্রশংসা করিত।*

এই খানে বৎসর কাল তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার শিক্ষার ভার তিনি সম্পূর্ণতঃ স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন। যে কারণেগ হউক তাঁহার অন্য কোন সন্তানের এই সৌভাগ্য হয় নাই। প্রাতঃকালে উপাসনাদি সমাপন করিয়া তিনি আমাকে নিকটে ডাকিতেন এবং নানাবিধ সদ্‌গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট অংশ সকল একখানি খাতাতে উদ্ধৃত করাইতেনও তাহার অর্থ বলিয়া দিতেন। এই সকল অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া পর দিবস তাঁহাব নিকট আবৃত্তি করিতে হইত। প্রধানতঃ বাইবেল ও Conway's Sacred Anthology নামক পুস্তকে সংগৃহীত নানা দেশের ধর্ম্ম ও নীতি গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ বাক্যাবলী এইরূপে শিক্ষা দিতেন। এতদ্ভিন্ন ইংরাজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ, পাটীগণিত ও জ্যামিতি রীতিমত পড়াইতেন। ইতিহাস অধিকাংশ সময়ে মুখে মুখে বলিতেন। দ্বিপ্রহরে নিযুক্ত রাখিবার জন্য অনুবাদ ও Parsing এর যথেষ্ট কাজ দিয়া যাইতেন। কাছারী হইতে আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া, যখন জলযোগ করিতেন, তখন আমাকে কাছে দাঁড় করাইয়া সেদিনকার নির্দ্দিষ্ট যে পাঠ তাহা পরীক্ষা করিতেন। এতদ্ভিন্ন Morning and Evening Meditations নামক পুস্তক হইতে একটি করিয়া কবিতা বা ধর্ম্ম সঙ্গীত মুখস্থ বলাইতেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বন্ধু বান্ধবদিগকে লইয়া তিনি কোন সৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন, এবং তৎপরে সকলকে লইয়া উপাসনা করিতেন। উপাসনা কালে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে কিছু উপদেশ দিতেন। এই নিয়ম তাঁহার গৃহে তাঁহার জীবনের শেষ দেড় মাস কালই কেবল রক্ষিত হয় নাই।

মানিকগঞ্জ হইতে তিনি পুনরায় ঠাকুরগাঁয়ে এবং তথা হইতে

জলপাইগুড়ি প্রেরিত হন। জলপাইগুড়িতে গিয়া তিনি অতিশয় উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। এই সময় কুচবিহার-বিবাহ লইয়া ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়া, উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পিতা মহাশয় সাধারণ-সমাজ প্রতিষ্ঠাতৃগণের সঙ্গে ছিলেন। ইতি পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি তাঁহার যেমন অপরিমেয় ভক্তি ছিল, এখন তদনুরূপই অশ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি তীব্র ভাষায় তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন। শেষ বয়সে সেই অসংযত ভাব ও ভাষা স্মরণ করিয়া তিনি অনুশোচনা করিয়াছেন। সাময়িক উত্তেজনা ও অসদ্ভাব চিরদিন থাকেনা। কেশবচন্দ্র সেনের প্রকৃত মহত্ত্ব ও তাঁহার ধর্ম্মভাব পিতৃদেবের ন্যায় উদারচেতা ব্যক্তি কখনই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে কেশব বাবু প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই মতভেদ ছিল। তাহার একটি স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা ও সামজিক অধিকারাদি সম্বন্ধে। যে জ্ঞানকে তিনি চিরদিন স্থির গভীর অনুরাগের সহিত পূজা করিয়াছেন, তাহা কেবল পুরুষের অর্জ্জনীয় মনে করিয়া তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। জ্ঞান নারীর মন কঠোর করে, একথা শুনিলেই তিনি বলিতেন, তবে কি জ্ঞানী পুরুষ অজ্ঞান পুরুষ হইতে হৃদয়ের বৃত্তিতে হীনতর? একদিন দৃষ্টান্ত স্থলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু আনন্দমোহন বসু আমা হইতে অনেক বেশী জ্ঞানী, একজন বড় গণিতজ্ঞ (Mathematician), আমি কি তাঁহার চেয়ে কোমল প্রকৃতির লোক?" তিনি জ্ঞানকেই মনুষ্যত্বের প্রধান উপকরণ ও অজ্ঞানতাকে কুসংস্কার ও কদাচারের প্রসূতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। স্বীয় কন্যাদিগের সুশিক্ষার জন্য তিনি যে পরিমান সময় শক্তি ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, *তাঁহার অবস্থায় আর কেহ সেরূপ করিয়াছেন কি না জানি না। যখন কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে

স্ত্রীলোকদিগের জন্য বি, এ, পরীক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয় নাই, তিনি তখন হইতে স্বীয় কন্যাকে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়াইবার অভিলাষ পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। তাই বলিয়া বি, এ, পাশ করা শিক্ষার চরম পরিচয়, এমন কথা কোন কালে মনে করেন নাই। বরং বি, এ এবং এম, এ উপাধিধারিগণের অধিকাংশেরই বিদ্যার অগভীরতা দেখিয়া আক্ষেপ করিতেন। জ্ঞানানুরাগের সহিত চিন্তা অধ্যয়নও আত্মোৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা মিলিত হইলে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি শোভিত না হইয়াও, বিদ্যালাভ করা যায়, নিজের জীবনেই তাহা দেখিয়া গিয়াছেন।

জলপাইগুড়ি অবস্থান কালে তিনি ছুটি পাইলেই রঙ্গপুর ও সৈদপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিতে যাইতেন। সৈদপুর ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহারি স্থাপিত। জলপাইগুড়িতে বালিকা বিদ্যালয়ের অনেক উন্নতি করিয়া ছিলেন। এখানে নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র বালকদিগের জন্য একটি স্কুলও খুলিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

জলপাইগুড়ি হইতে ত্রিপুরার অন্তর্গত মোরাদনগর বদলী হন। সেখানেও একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া আসেন। তথা হইতে যশোহর গিয়া ছাত্রদিগের জন্য একটি সাপ্তাহিক উপাসনা-সভা স্থাপন করেন। এই খানেই তিনি তাঁহার Discourse on Education শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

যশোহরের অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুতে নিজে ও পরিবারস্থ প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়াক্রান্ত হওয়াতে,তিনি ১৮৮০সনের ডিসেম্বর মাসে ছুটী লইয়া স্বীয় জন্মস্থান বাখরগঞ্জে আসেন, এবং চেষ্টা পূর্ব্বক বরিশালেরই মুন্সেফ হন। কিন্তু যশোহর বাসের ফলে তাঁহার চতুর্থ কন্যাটিকে আড়াই বৎসর বয়সে হারাইতে হয়। এই তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রথম সন্তান শোক।

বরিশালে তাঁহার পূর্ব্ব বন্ধুগণ তখনও বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্বে, অভাবের দিনে, তিনি সমস্ত প্রাণ মন ঢালিয়া, কাজ করিবার সুবিধা পান নাই, এবার আসিয়া নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পুরাতন বন্ধু গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্নী স্বগৃহে এবং ব্রাহ্মিকা-সমাজে সুন্দর উপাসনা করিতেন, পিতা মহাশয় তাঁহাকে প্রচারিকা ব্রতে দীক্ষিত করিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে তাঁহাকে বসিবার অধিকার দেওয়াইলেন। বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগের মধ্যে দুই এক জন বৃদ্ধ এই কার্য্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। ইহার ফলাফল সম্বন্ধেও সংশয় ও ভয় যথেষ্টই ছিল, কিন্তু ফল ভালই হইল। পর বৎসর মাঘোৎসবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কমিটী মনোরমা দেবীকে এক দিন কলিকাতা সমাজের বেদী গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে কেবল মতের উদারতা নহে, তাহাদিগকে সকল উচ্চাধিকার দিবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আকাঙ্ক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করিবার দুর্লভ সাহস, তাঁহার মধ্যে ছিল।

এই সময়ে বালক বালিকাদের জন্য একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় (Sunday School) স্থাপন করিলেন। তখন পর্য্যন্ত কলিকাতায় আমাদের বর্ত্তমান Sunday School বা রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই।

১৮৮৩ সনে প্রথম বাঙ্গালা রচনায় মনোযোগী হইলেন। প্রথম প্রথম কন্যার দ্বারা রচনা সংশোধন করাইয়া লইতেন, ক্রমে ভাষা আয়ত্ত হইয়া আসিল। তাঁহার প্রথম রচিত প্রবন্ধগুলি ঐতিহাসিক। অতঃপর 'জীবন গতি নির্ণয়' নামক দার্শনিক পুস্তিকা রচনা করেন। এই বৎসরের মধ্য ভাগে তিনি সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষ-কের সাহায্যে সংস্কৃত বাল্মীকির রামায়ণ খানি পড়িয়া ফেলেন। শিশুকালে

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়িয়াছিলেন। নিজের গৃহে প্রত্যেক সন্তানকেই শৈশবে রামায়ণ মহাভারত কিনিয়া পড়িতে দিয়াছেন। বাস্তবিক এই দুই গ্রন্থের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য ভালবাসা ছিল।

সংস্কৃত রামায়ণ পাঠের পর একখানি বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করিয়া ছিলেন, তাহার নাম 'লঙ্কাকাণ্ড'। উহাতে রামায়ণে উল্লিখিত কতগুলি নামের অন্তরালে তাৎকালিক ইংরাজ শাসনাধীন বঙ্গের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।* অনেকেই এই পুস্তক খানির নূতনত্বেরও রসিকতার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৮৪ সনে 'টমকাকার কুটীর' নাম দিয়া Uncle Tom's Cabin অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার আশ্চর্য্য লিখিবার শক্তি ছিল। যাহা ধরিতেন তাড়াতাড়ি শেষ করিতেন। অনেকক্ষণ বসিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, শব্দ বাছিয়া লিখিবার জন্য সময় ব্যয় করিতেন না, এবং অপরকে এরূপ করিতে দেখিলে বিরক্ত হইতেন।

টমকাকার কুটীর লিখিতে লিখিতে তাঁহার মনে হইল, মিসেস বিচার ষ্টো তাঁহার এই গ্রন্থ রচনা করিয়া আমেরিকার দাসত্ব প্রথার জঘন্যতা তাঁহার সরস চিত্রে যেরূপ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া এদেশের কুপ্রথাও কুশাসন সকলের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস আবশ্যক। এই চিন্তা হইতে তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয়। এতদর্থে তিনি নানা স্থান হইতে ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি মেদিনীপুরে বদলি হইলেন। 'টমকাকার কুটীর' মেদিনীপুরে সম্পূর্ণ হয়। এই অনুবাদ কার্য্য শেষ করিয়া তিনি 'মহারাজ নন্দকুমার' লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই পুস্তকের স্থানে অস্থানে তিনি ঐতিহাসিক তত্ত্ব সন্নিবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। Calutta Public Library হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন

কালের কাগজ পত্র ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিবার জন্য এবং পুস্তক রচনার যথেষ্ট অবসর পাইবার ইচ্ছায়, তিনি ১৮৮৫ সনের আগষ্ট মাসে দীর্ঘ ছুটী (furlough) লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মেদিনীপুর অবস্থান কালে স্থানীয় ব্রাহ্মদের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। সেখানে প্রতি বুধবার সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন এবং নিকটবর্ত্তী এক বৈষ্ণব সমাজে আহুত হইয়া প্রায় প্রতি সপ্তাহেই গিয়াছেন।

'মহারাজ নন্দকুমারের' পরে 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' রচনা করেন, উহা ১৮৮৬ সনে প্রকাশিত হয়। অতঃপর 'অযোধ্যার বেগম' ও 'মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা'। ১৮৮৮ সনে 'ঝান্সির রাণী' প্রকাশিত হয় ইহার অনেক বৎসর পরে ১৮৯৫ সনে 'এই কি রামের অযোধ্যা' ?—লেখা হয়। এই সকল পুস্তকের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসের সহিত ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার। নন্দকুমারাদি লিখিয়া তিনি অচিরাৎ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিলেন।*

ভারতবর্ষের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লিখিবার সাধ তাঁহার বহুকাল হইতেই ছিল। এতদর্থে তিান বহুদিন ধরিয়া বহুব্যয়ে পুরাতন ঐতিহাসিক গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই।

ধারাবাহিকরূপে তাঁহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনা লিখিবার অবসর আজ নাই। তিনি মুন্সেফ ও সবজজের পদে থাকিয়া কিরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্য করিতেন, ন্যায়ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বাধীনও নির্ভীকভাবে বিচার করিতেন, অনেকে তাহা বিদিত আছেন। দুইটি মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহার স্বাধীনতাও নির্ভীকতার বিশেষ প্রশংসা শুনিয়াছি। একটি যখন তিনি মজঃফরপুরে সবজজ। এই মোকদ্দমায়

দ্বারভাঙ্গার মহারাজ এক পক্ষে ছিলেন। প্রতিপক্ষ Advocate General Sir Charles Paul কে আনাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মোকদ্দমা গড়গাছা Trenching ground বিষয়ক। এখানেও অর্থবল লোকবল ও আইনের কুটতর্ক জাল সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারের নিকট পরাস্ত হইয়াছিল।

যশোহর ও নদীয়া থাকিতে বিধবাদিগের সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে অনেক মোকদ্দমার বিচার করিতে হয়। ইহাতে হিন্দু বাল্যবিধবা দিগের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অন্য প্রকার ধারণা জন্মে। অথচ তাহাদিগের হীনতার জন্য তিনি তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া সমাজকেই এজন্য দায়ী মনে করিতেন। তাঁহার উক্ত ধারণা তিনি তাঁহার এক রায়ে প্রকাশ করিয়া দেশের অনেকেরই বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিতে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি আর একজন জ্ঞানী পুরুষের ন্যায় বলিতে পারিতেন, Let truth lead where it will" অথবা Let Justice reign though the Heavens fall. বাস্তবিক তাঁহার চরিত্রে সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য বিশেষত্ব তাঁহার তেজস্বিতা। এমন তেজস্বী পুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার তেজঃশক্তি তাঁহার কথা ও কার্য্যের মধ্য দিয়া সতত প্রকাশ পাইয়াছে। কর্ত্তব্য জ্ঞান অনেকের থাকে, কর্ত্তব্য করিবার অভিলাষও অনেকের আছে, কিন্তু যে তেজস্বিতা এই জ্ঞানও ইচ্ছাকে কার্য্যকরী করে ও সফলতা দেয়, তাহা সকলের মধ্যে পাওয়া যায় না, পিতা মহাশয়ের মধ্যে তাহা দেখিয়াছি। যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ ধরিয়াছেন, যাহা ধরিয়াছেন, তাহা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। করি-কি-না-করি বলিয়া সহস্রবার ইতস্ততঃ করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল।

এই তেজস্বিতা ও ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে আশ্চর্য্য ভক্তি বিশ্বাসও ব্যাকুলতা তাঁহাতে ছিল। সর্ব্বদা শিশুর ন্যায় অকপট ব্যাকুল প্রাণে কার্য্য সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রতিদিন কাছারী যাইবার পূর্ব্বে কয়েক মিনিট বসিয়া প্রার্থনা করিয়া যাইতেন, যেন বিচার কার্য্য ন্যায়ানুমোদিত হয়, যেন ভ্রম প্রমাদ না ঘটে। শেষ কথা কয়টি যেন এখনও শুনিতেছি, "হে পিতঃ শুভ বুদ্ধি দাও, শুভ বুদ্ধি দাও, শুভ বুদ্ধি দাও।" সে কি ব্যাকুলতা!

তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা চিরদিন বলবতী ছিল। প্রথম বয়সে অর্থাভাবে কতগুলি বিষয় অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন। ঢাকায় যখন ওকালতীর জন্য পড়িতেন, তখন তথাকার লাইব্রেরীতে বোধ্য ও অবোধ্য সকল বই একবার করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অনেকগুলি ভালরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। যখন চাকরী করিতেন, দিনে সময়াভাব বলিয়া, রাত্রিকালে পুস্তক পাঠ করিতেন। শেষ বয়সে রাত্রে পড়িতেন না, কিন্তু বিনা অধ্যয়নে তাঁহার এক দিনও যায় নাই। তাঁহার সংসার খরচের মধ্যে গ্রন্থ ক্রয় একটি প্রধান খরচ ছিল। কেবল যে নূতন গ্রন্থ ক্রয় করিতেন তাহাই নহে, পুরাতন ও দুর্ল্লভ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির জন্য নানা পুস্তকালয়ে যাইতেন। পুরাতন পুস্তক বিক্রেতৃগণ তাঁহাকে খুব চিনিত ও লাভের আশায় বাড়ীতে আসিয়া প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় নানা বই দেখাইত। গত বৎসর পর্য্যন্তও বিলাত হইতে বহুব্যয়ে নূতন নূতন পুস্তক আনাইয়াছেন। ১৯০১ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা পীড়িত হইলে, যখন তাঁহাকে লইয়া ওয়াল্টেয়ার (Waltair) যান, তখন সেখানে টেলেগু ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন।

যাহা নিজে অধ্যয়ন করিতেন, তাহা অপরকে, বিশেষ সন্তানদিগকে

জানাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইতেন। এমন কি, অনেক সময়ে তাহাদের বয়সও বুদ্ধির পক্ষে অধ্যেয় বিষয় দুষ্প্রবেশ্য হইলেও সহজে ছাড়িতেন না; ইহাতে সন্তানদিগের মধ্যে কাহারও উপকার হইয়াছে, কাহারও অপকার। তিনি জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞান প্রচার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার কন্যারা গৃহে বসিয়া ঐতিহাসিক ও দার্শনিক গ্রন্থ সকল রচনা করেন। একদিন তাঁহার এই কন্যা বলিয়াছিলেন, "বই লেখা সকলের কাজ নহে, সকলের সে শক্তি থাকে না।" তিনি বলিলেন, "শক্তি থাকে না, শক্তি আসে। মানুষ যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই করিতে পারে। আমি বলিতে পারি, আমি যদি ইচ্ছা করি, এখন লাটিন ভাষায় কবিতা লিখিতে পারিব।" আমরা সকলে হাসিলাম, তিনি ইহাতে হাসির কিছু দেখিলেন না।

তাঁহার সহকর্ম্মচারিগণ ধর্ম্মভেদও মতভেদ সত্বেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারেন নাই। তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন, প্রায় সকলের সঙ্গেই তাঁহার সদ্ভাব জন্মিয়াছে। তিনি সরলও স্পষ্টবাদী ছিলেন, লোকের মন যোগাইয়া কথা বলিতে জানিতেন না। "ন ব্রুয়াৎ সত্যং অপ্রিয়ম্" এই শাস্ত্রবাক্য সত্যের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ বশতঃই পালন করিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাও ভালবাসা পাইয়াছেন। সকলে তাঁহাকে 'পাগলা চণ্ডী' বলিয়া তাঁহার সত্যবাদিতাও অকুতোভয়তারই সাক্ষ্য দিয়াছে। সকল প্রকার দেশ হিতকর কার্য্যে তাঁহার উৎসাহও অনুরাগ, যোগও সহানুভূতি ছিল। যেখানে গিয়াছেন ধর্ম্মও সমাজ সংস্কার কার্য্যে আত্মনিয়োগ না করিয়া পারেন নাই; দুর্নীতিও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজশক্তি যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়াছেন। যৌবনে এই ভাব অনেকের মধ্যেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বার্দ্ধক্যের সঙ্গে

এদেশে, হয়তো সর্ব্ব দেশেই, সাধারণ লোক সকল বিষয়ে একটু রক্ষণশীল, একটু পশ্চাৎপদ হয়। পিতৃদেব যে নিগড় একবার ভাঙ্গিয়াছেন, সে নিগড় আর পায়ে তুলিয়া লয়েন নাই, যাহা কুসংস্কারও কদাচার বলিয়া জীবনের আরম্ভে বুঝিয়াছিলেন, তাহা বার্দ্ধক্যেও সেই চক্ষেই দেখিতেন; চল্লিশের পর দৃষ্টি ক্ষীণ হয় নাই। তিনি নিজ মতের অস্থিরতা ও অগভীরতাকে উদারতা নাম দিয়া, সকলের সহিত ঐক্য প্রকাশ করিতে কদাপি ব্যস্ত হন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিও ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ চির দিন সমান ছিল। শেষ জীবন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিয়োগ করিবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল, এই আকাঙ্ক্ষা-প্রণোদিত হইয়া দুইবার মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে গিয়াছেন। পীড়ার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজে সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন, শয্যাশায়ী হইয়াও যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

অথচ তাঁহাতে একদেশ-দর্শিতা বা সঙ্কীর্ণতা ছিলনা। হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্মও মুসলমান ধর্ম্মের যেখানে যাহা সুন্দর পাইয়াছেন তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন; ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদর্শানুসারে তাঁহার ছিল 'সত্যং শাস্ত্রম্'। খৃষ্টধর্ম্মের উপর এবং খৃষ্টানদিগের উপর অনেকের বিজাতীয় বিদ্বেষ দেখা যায়; তিনি ইতিহাসজ্ঞও জীবন চরিত্র পাঠে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; খৃষ্টান মিশনারীরা যে ঈশ্বরের কৃপার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া, এদেশে আসিয়া আমাদিগের শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিতেন এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। "Render unto Cæsar the things which be Cæsar's" আমার বাল্যকালে আমাকে এই বাক্যটি মুখস্থ করাইয়াছিলেন, নিজের কার্য্যেও এই উপদেশ পালন করিতেন। মহম্মদের প্রতি তাঁহার অনুরাগ কম ছিল না।

তাঁহার মত বিশ্বাস ও প্রচারের কথা কিছু বলা হইল, কিন্তু তাঁহার দয়া ও দানশীলতার কথা বাহিরের সকলে জানে না। তাঁহার রুক্ষ ও কোপন স্বভাবের নিম্নে যে কি স্নেহশীল প্রকৃতি ছিল, তাহা তাঁহার নিতান্ত

আত্মীয় স্বজনদেরও সকল সময়ে মনে থাকিত না। যখন বরিশালে উকীল ছিলেন এবং কোন প্রকারে, অতি কষ্টে পরিবার পালন করিতে ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ ১৮৭২ সনের শেষ অথবা ১৮৭৩ সনের আরম্ভে, তিনি হিন্দু সমাজ হইতে পলায়মানা ও ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় প্রার্থিনী একটি বাল বিধবাকে গৃহে স্থান দান করিয়া ভরণ পোষণ করিয়াছেন। জলপাইগুড়ি অবস্থান কালে আর একটি বিধবাকে গৃহে রাখিয়া কিছুকাল পরে পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। জনৈক বিধবা আত্মীয়াকে কয়েক বৎসর হইতে স্বগৃহে আনিয়া রাখিয়াছিলেন; ইহার সহিত একত্র থাকিতে সন্তানগণ পাছে অসন্তুষ্ট হন, এই জন্য বাটীর এক পার্শ্বে তাহার জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রোগ শয্যায় শুনিয়াছিলেন উক্ত আত্মীয়ার একটি বিধবা কন্যা তাঁহার আশ্রয়ে আসিতেছে; নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সেই বালিকার জন্য তাহার মাতা অপেক্ষা তাঁহারই অধিক ভাবনা দেখা গিয়াছে; তিনি তাহার পৌঁছখবর না পাওয়া পর্য্যন্ত সুস্থির হইতে পারেন নাই। আর একটি নিঃসম্পর্কিতা, সমাজ ত্যক্তা বিধবা শেষ বয়সে আসিয়া তাঁহার গৃহে স্থান ভিক্ষা করাতে তিনি তাহাকেও গৃহে স্থান দিয়াছেন।

সন্তানগণের সুশিক্ষার জন্য তিনি অনেক করিয়াছেন, এবং তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল না দেখিয়া দারুণ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ অনেক সময়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, যে অন্য গৃহে জন্মিলে হয়তো তাঁহারা এত ধিক্কার না শুনিয়া, বরং প্রশংসা লাভ করিতেন। এ কথাও ঠিক। তিনি নিজের জীবনেও তৃপ্তি লাভ করেন নাই, সন্তান দিগের আচরণও ঠিক তাঁহার মনের মত হয় নাই, কারণ তাঁহার আশা ও আদর্শ অতিশয় উচ্চছিল।

তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি টলষ্টয় প্রণীত 'চল্লিশ বৎসর'.নামক একখানি উপন্যাস অনুবাদ করেন।

গত ১৯০৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার তৃতীয়া কন্যা প্রেমকুসুম অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনায় বাহিরে তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও অন্তরে বিষম আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি নীরবে সে ব্যথা বহন করিয়া আসিতেছিলেন। অবশেষে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার নব পরিণীত জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রমোহনের জীবনলীলা সাঙ্গ হইল। এই আঘাত তাঁহার ভগ্ন, জীর্ণ শরীরে আর সহিল না। তিন মাস নীরবে শোক চাপিয়া,পুত্রের কাজকর্ম্ম দেখিতেছিলেন; চতুর্থ মাসে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। এই রোগের যন্ত্রণাও নীরবে সহ্য করিয়া, ঠিক পুত্রের মৃত্যুর চারি মাস পরে, ১০ই জুন সন্ধ্যাকালে তিনি সকল রোগ শোক ও মৃত্যুর অতীত ধামে গমন করিলেন।

রোগ শয্যায় পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেন কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ কিছুই বলিতে পারিতেন না।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী আজীবন তাঁহার সেবা করিয়া আসিয়াছেন, পুত্র শোকে তিনিও নিতান্ত ভগ্ন হইয়াছিলেন, এই অবস্থায়ও তাঁহাকে নিজের সেবায় নিযুক্ত দেখিয়া সময়ে সময়ে অশ্রুপাত করিয়াছেন। সন্তানদিগকে নিজের জন্য রাত্রি জাগরণ করিতে দেখিলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন। অনেকবার বলিয়াছেন, "আমার জন্য কেন এত কষ্ট করিতেছ? আমার জীবনে যদি আর কাজ না থাকে, আমাকে বাঁচাইতে পারিবে না। এখনও যদি পরমেশ্বরের কোন কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হয়, তিনি আমাকে জীবিত রাখিবেন।"

৯৮ বেলতলা রোড
কালীঘাট, কলিকাতা।
১৭ই জুন, ১৯০৬।

পরিশিষ্ট

শ্রাদ্ধ বাসরে পঠিত স্বর্গীয় পিতৃদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে উল্লিখিত কয়েকটি ঘটনা সম্বন্ধীয় কথা :—

জন্ম তারিখ ও বংশাদি।

এই জীবনী লিখিবার সময় পিতৃদেবের জন্মতারিখ নির্ণয় করিবার অবসর হয় নাই। পরে অনুসন্ধানে জানিয়াছি, বাঙ্গলা ১২৫১ সনের ২রা মাঘ, মঙ্গলবার, ইংরাজী ১৪ই জানুয়ারী, শুক্লপক্ষের সপ্তমী ও ১৮ই মাঘ বৃহস্পতিবার, ইংরাজী ৩০এ জানুয়ারী, কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী ছিল। কোন পক্ষে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এখনও জানি না। কিন্তু তিনি ইংরাজী ১৯০০ সনের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে, পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পূর্ণ হইল বলিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বোধ হয় তাঁহার জন্ম জানুয়ারী মাসের প্রথমার্দ্ধে হইয়াছিল বলিয়াই তিনি জানিতেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার লিখিত বিবরণ পিতৃদেব কর্ত্তৃক আরব্ধ আত্ম জীবনী হইতে প্রাপ্ত। উক্ত জীবনী দুই তিন পৃষ্ঠার অধিক লিখিত হয় নাই।

পিতামহ দেবের উর্দ্ধতন পাঁচ জন পূর্ব্ব-পুরুষের নাম—

রামেশ্বর সেন

রামনারায়ণ সেন

বাসুদেব সেন

কৃষ্ণদেব সেন

রামরতন সেন

কৃষ্ণদেব সেন বাসণ্ডা গ্রামে বিবাহ করিয়া, এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার পিতা পিতামহাদি বেলতাখান ও তাহারও পূর্ব্বে মাইলারায় বাস করিতেন। উভয় গ্রামই বাখরগঞ্জে। পিতা মহাশয়ের মুখে শৈশবে শুনিয়াছি, তাঁহার বংশের আদিস্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত পুরাতন রাজনগরের নিকট পোড়াগাছা নামক গ্রামে ছিল।

কৃষ্ণদেব সেনের চারি পুত্র। তন্মধ্যে তিন পুত্রের বংশ অদ্যাবধি বাসণ্ডা গ্রামে বর্ত্তমান। রামরতন ও রামচন্দ্র এই দুই ভ্রাতা একত্র বাস করিতেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামরতনের পুত্র, আমাদের পিতামহদেব নিমচাঁদ, সোদর নির্ব্বিশেষে দুই খুল্লতাত পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালন করিয়া বহুকাল তাঁহাদিগকে লইয়া এক গৃহে একান্নে বাস করেন। মধ্যে কিছুকালের জন্য দুই পরিবার পৃথক্ হইয়া যায়, কিন্তু পিতামহী দেবীর মৃত্যুর পর পিতামহ তাঁহার বালক পুত্র ও বালিকা পুত্রবধূ লইয়া আবার তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হন। স্নেহ-প্রবণ, উদার চিত্ত, ক্ষমাশীল পিতামহ দেবের এই কাজটি তাঁহার নিজের ও পুত্র বধূর বহু দুঃখ, দারিদ্র ও নির্য্যাতনের কারণ হইয়াছিল। একান্নবর্ত্তি পরিবারে শ্রম বিভাগ বশতঃ সুবিধা যথেষ্ট, কিন্তু অশান্তি ও নিরীহ জনের প্রতি অত্যাচার তদপেক্ষা অনেক অধিক।

বালিকা বধূর প্রতি বালক স্বামীর অত্যাচার।

বালক চণ্ডীচরণ পূজা পর্ব্বাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া যখন শ্বশুর গৃহে যাইতেন, তখন সেখানে বালিকা বধূর যত্ন রক্ষিত পুত্তলাদি ও অন্যান্য খেলানা দরজার উপরিস্থ তাকের উপর সজ্জিত দেখিতেন। কখনও বা দেখিতেন, বালিকার হাতের গাঁথা বকুল ফুলের দীর্ঘ মালা

কৃষ্ণাদি মৃণ্ময় ঠাকুরের গলায় ঝুলিতেছে। তিনি মালাগুলি বালিকার মাতামহীর নিকট তৎক্ষণাৎ চাহিয়া লইতেন এবং অল্পকাল মধ্যেই ক্রীড়াচ্ছলে শতছিন্ন করিতেন। বাক্স খেলানাদির জন্য নিজের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া বাহানা ধরিতেন। তাঁহার উৎপাতে অস্থির হইয়া তাঁহার পিতাকে অবিলম্বে বৈবাহিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে হইত, "বেহাই, আপনার জামাই এখানে কি খেলনা দেখিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, বাড়ীতে তিষ্ঠা দায়।" শ্বশুর জামাতার স্বভাব জানিতেন, অবিলম্বে কন্যাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া, কখনও বা কাঁদাইয়া, তাহার খেলানাটি দিয়া জামাতাকে তুষ্ট রাখিতেন। বলা বাহুল্য যে খেলানাটি বালকের চঞ্চল হস্তে অল্পক্ষণেই ভগ্ন ও চূর্ণ হইত।

বালিকা যখন শ্বশুর গৃহে যাইতেন, গৃহিণী রাত্রিকালে আপনার এক পার্শ্বে পুত্র ও অপর পার্শ্বে বধূকে লইয়া শয়ন করিতেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইলেই বালক উঠিয়া আসিয়া বালিকাকে ইচ্ছামত প্রহার করিয়া আবার গিয়া নিজ স্থান অধিকার করিতেন।

পূজা পর্ব্বাদিউপলক্ষে সুন্দর এক জোড়া কাপড়ের এক খানি বর ও এক খানি বধূ পাইতেন, বর দুই চারি দিনে আপনার বস্ত্র খানি ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া, বাক্স খুলিয়া বধূর খানি দখল করিতেন। অথচ বালকের শৈশবের ব্যবহৃত সোণার বাজু ভাঙ্গিয়া মাতা বধূর জন্য এক খানি গহনা গড়াইয়াছিলেন বলিয়া বালক বার বার "আমার বাজু আনিয়া দাও" বলিয়া, তাঁহাকে বড়ই অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আমের দিনে বালিকা সাধ মিটাইয়া আম খাইবেন বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে শ্বশুর গৃহে যাইতে দিতেন না। শ্বশ্রূ দেবী দুঃখ করিতেন, "বউকে বাড়ীর গাছের বড় বড় আম খাওয়াইতে পারিলাম না।"—কখন ভাল ও বড় বাছিয়া কয়েকটি আম লুকাইয়া রাখিয়া বধূকে কিছু কালের

জন্য নিজ গৃহে আনাইতেন। শ্বশুর বা খুড়-শ্বশুরের কোলে উঠিয়াই বধূ আসিতেন, অন্য যান বাহনের আবশ্যক হইত না। বধূ আসিলে শ্বাশুড়ী বলিতেন,—"এস মা, এমন বড় আম দিব, তোমার হাতে ধরিবে না।" আম আনিতে গিয়া দেখিতেন, সর্ব্বনাশ! ছেলে লুকাইয়া লুকাইয়া সব খাইয়া ফেলিয়াছে! তখন নিজ ললাটে করাঘাত করিতেন। বালক উল্লাসের সহিত বলিতেন,—"আমাকে ফাঁকি দিবে?"

উত্তর কালে এ সকল গল্প মাতৃদেবীর ও পিতৃদেবের যথেষ্ট আমোদ বিধান করিত, কিন্তু বাল্যকালে মাতৃদেবীর পক্ষে এগুলি নিশ্চয়ই বিশেষ আমোদ জনক হয় নাই।

বাল্য জীবনে পিতৃ মাতৃ প্রভাব।

জন্মভূমি নামক একখানি পত্রিকার ১৮৯৬ সনে পিতৃদেবের এক সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়, তাহার প্রথমাংশ বর্ত্তমান জীবনীর প্রথমাংশের সম্পূর্ণ অনুরূপ। বোধ হয় এই বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে লেখক পিতা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিজের মুখেই অনেক কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। উহার এক স্থানে আছে—

"ধর্ম্মভীরু পিতা মাতার সদ্দৃষ্টান্তই চণ্ডী বাবুর চরিত্র গঠন করিয়াছে। নতুবা চণ্ডী বাবু যে গ্রামে জন্মিয়াছেন সে গ্রামটী সুরাপানের জন্য প্রসিদ্ধ। অন্যান্য স্থানে মদ বোতলে বোতলে বিক্রয় হয়, কিন্তু চণ্ডী বাবু যে গ্রামে জন্মিয়াছেন সেখানে, চণ্ডী বাবুর বাল্যকালে কলসে কলসে মদ্য বিক্রয় হইত। চণ্ডী বাবুর আত্মীয় স্বজন প্রায় সকলেই সুরাপায়ী ছিলেন। কিন্তু বাল্যকালে চণ্ডী বাবুর মাতা পুত্রকে বলিতেন যে, তুমি মদ খাইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব। ইহাতেই চণ্ডী বাবু সুরার প্রলোভন হইতে নির্ম্মুক্ত ছিলেন।"

আমার বিবাহের পর দিবস উপাসনান্তে পিতা মহাশয় আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

"আমি আমার পিতার নিকট একটি ধন পাইয়াছি, তাহা তোমাকে দিতে চাই, তুমি তাহা যত্নে রক্ষা করিবে। সেটি প্রাতঃকালে সন্ধ্যাকালে বা কোথাও যাত্রাকালে দেবতার নাম স্মরণ। দুর্গা নাম না লইয়া আমার পিতা কোন কাজ আরম্ভ করিতেন না, বা গৃহ হইতে এক পদ নিষ্ক্রান্ত হইতেন না। তুমিও যাঁহাকে দেবতা বলিয়া জান, সকল উদ্যোগের পূর্ব্বে তাঁহাকে স্মরণ করিবে, সকল সঙ্কটে তাঁহাকে ডাকিবে।"

কালীমোহন বাবুর বাসা ও Free Church Institution

কালীমোহন বাবুর বাসা ভবানীপুরে, কালীঘাটের নিকটস্থ বেলতলা নামক স্থান। আশ্চর্য্য ঘটনা সূত্রে কালীমোহন বাবুর বাড়ীর সন্নিকটেই উত্তর কালে পিতা মহাশয়ের ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। বেলতলা হইতে পদব্রজে নিমতলা ঘাট প্রায় ৬ মাইল রাস্তা প্রাতিদিন যাতায়াত সহজ ব্যাপার নহে।

সামান্য ঘটনার জীবনব্যাপী ফল।

কালাচাঁদ নামে কালীমোহন বাবুর বাড়ীতে কে একটি ভদ্র লোক থাকিতেন। বোধ হয় লোকটি কালীমোহন বাবুর মোহরের ছিলেন। এই ব্যক্তি সুরাপায়ী ছিলেন, অনেকবার মত্ত অবস্থায় রাস্তার পার্শ্বে নর্দ্দমায় পড়িয়া থাকিতেন। পিতা মহাশয় বহুবার আমাদিগকে বলিয়াছেন, "যদি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় সেদিন Livingstone সাহেবের সহিত দেখা না হইত, যদি ঢাকা ছাড়িবার অভিপ্রায় ত্যাগ না করিতাম, ক্রমে

উকীল, মুন্সেফ ও সবজজ হইবার সুযোগ ঘটিত না, অল্প আয়ে কালী মোহন বাবুর মোহরেরগিরি করিয়া কালাচাঁদের সংসর্গে কালাচাঁদের দশাই ঘটিত।"

আমার ভগিনীর জন্ম।

বাঙ্গলা ১২৭৮ সনের ৬ই আষাঢ়, ইংরাজী ১৮৭১ সনের জুন মাসে আমার ভগিনী যামিনীর জন্ম হয়, সুতরাং পিতৃদেব যখন আমাদিগকে জন্ম গ্রাম হইতে লইয়া আসেন, তখন তাহার বয়স মাত্র আড়াই মাস, আমার বয়স প্রায় সাত বৎসর।

পিতামহ দেব পূর্ণ দেড় বৎসর কাল বাতব্যাধি বা পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগত ছিলেন। রোগের প্রথম অবস্থায় তাঁহার বুদ্ধি পরিষ্কার ছিল, কিন্তু তাঁহার একার্দ্ধ যেমন সম্পূর্ণ অসাড় হইয়া যাইতে লাগিল, বুদ্ধিও সেইরূপ জড়তা প্রাপ্ত হইল। কোন কোন বিষয়ে বুদ্ধিমানের মত কথা কহিতেন বটে কিন্তু আর কতগুলি বিষয়ে শিশুর মত অবস্থা হইয়াছিল। এই দেড় বৎসর কাল আহার নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া মাতৃদেবী দিবানিশি শ্বশুরের পরিচর্য্যা করিয়াছেন। আমার তিন পিতৃস্বসা স্ব স্ব শ্বশুরালয়ে থাকিতেন, যদি বা কদাচিৎ পিত্রালয়ে আসিতেন, পিতার শারীরিক ও মানসিক বিকৃত ও শোচনীয় দশা দেখিয়া কেবল বিলাপ পরিতাপই করিতেন, সেবা করা দূরে থাকুক ঘৃণায় বহুক্ষণ নিকটেও থাকিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ বৃদ্ধের একমাত্র পুত্রবধূ ছাড়া প্রাণ দিয়া সেবা যত্ন করিবার আর কেহ ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বের শেষ কয়েক মাস কিরূপ শারীরিক অবস্থা লইয়া বধূ এই কঠিন সেবাব্রত উদযাপন করিয়াছেন, মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ কেবল শ্বশুরের সেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল না, একলা তাঁহাকে খুড়

শ্বশুরের সংসারের রন্ধনাদি সমুদয় গৃহ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইয়াছে। তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যুর রাত্রে মাঘ মাসের দারুণ শীতে, নদীতে স্নান করিয়া আর্দ্রকেশে আর্দ্রবসনে তাঁহাকেই স্বহস্তে শ্বশুরের মুখে অগ্নি সংযোগ করিতে হয়। এক মাস কাল এক বেলা হবিষ্যান্ন খাইয়া, তাঁহাকেই পুত্র স্থানীয় হইয়া রীতিমত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিতে হয়। তখন শিশু ছিলাম, এই সেবা ও কৃচ্ছ্র সাধনের গুরুত্ব যথারূপ অনুভব করিতে পারি নাই। মাতৃদেবীর তখনকার শারীরিক অবস্থা এবং সেই সেবা-পরায়ণতা ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠা এখন অতুলনা বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, এই জননীর এই সময়ের সন্তান বলিয়াই কর্ত্তব্য পালনে এবং সেবাকার্য্য ভগিনী যামিনীর এমন তৎপরতা।

সাধারন লোকের মধ্যে পিতা মহাশয়ের সুখ্যাতি।

তাঁহার গুণগানপূর্ণ ও লেখকের কৃতজ্ঞতাসূচক এক খানি বেনামী চিঠিতে এই অদ্ভুত পদ্য দেখিয়াছিলাম।

"বুদ্ধে (বুদ্ধ্যা ?) যেন বৃহস্পতি, বিচারেতে দাশরথি
ধর্ম্মে যেন ধর্ম্মের নন্দন,
দীন প্রতি দয়া অতি প্রজার কল্যাণে মতি
নামা সেন চণ্ডীচরণ।"

চাপরাসী পেয়াদা ও বাড়ীর ভৃত্যাদির নিকটও শুনিতাম, যে, সাধারণ লোকে পিতা মহাশয়ের বিচারের সর্ব্বদা সুখ্যাতি করে। হুঁকা টানিতে টানিতে কড়া তামাকের সঙ্গে তুলনা করিয়া যখন চাষারা বলিত, হাকিম বড় কড়া, তখন প্রশংসাচ্ছলেই সে কথা বলিত।

কন্যাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে পিতৃদেবের মত ও কার্য্য, শক্তি সময় ও অর্থদান।

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় এবং বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় উভয় স্থানেরই সকল বালিকার পিতা হইতে আমার পিতার আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল ছিল, তাহা আমি সেই বয়সেই সবিশেষ জানিতাম ও বুঝিতাম। অবশ্য পিতৃমাতৃ হীন যে কয়েকটি বয়স্থা বাল্য-বিধবা ছিলেন, তাঁহাদের কথা ভিন্ন। তাঁহাদের কেহ বা বিদ্যালয়ের হিতার্থিনী কোন ইংরাজ রমণীর সাহায্যে, অনেকেই বদান্যবর দুর্গামোহন দাসের, কেহ বা আনন্দমোহন বসুর অর্থে ও স্নেহে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে ছিলেন।

আজ কাল বোর্ডিং স্কুলের বেতনের পরিমাণ কিছু হ্রাস হইয়াছে। মিস্ এক্রয়েডের (Miss Akroyd) প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে মাসিক কুড়ি বাইশ টাকা দিতে হইত। ইংরাজ বালিকাদের অনুরূপ ডজন হিসাবে পরিচ্ছদাদি দিতে ও এককালীন অনেক ব্যয় হইত, এতদ্ভিন্ন খুচরা খরচও কত গুলি ছিল। জুতা মোজা ও বস্ত্রের সংখ্যা সম্বন্ধে কঠিন নিয়ম না থাকাতে, ইদানীং অনেক গরীব ব্রাহ্ম অল্প ব্যয়ে কন্যার সুশিক্ষা বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের বাল্যে আমাদিগকে অনেকটা ইংরাজ বালিকাদের অনুকরণে চলিতে হইয়াছে। আমরা বেথুন বিদ্যালয়ে আসিবার পর হিন্দু বালিকাদের দেখাদেখি জুতা মোজা সম্বন্ধীয় কড়া নিয়ম আপনারাই শিথিল করিয়া ফেলি। মেম শিক্ষয়িত্রীগণও বেথুন স্কুলে আসিয়া আর তাহাতে বিশেষ আপত্তি করেন নাই। তথাপি আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, পিতা মহাশয় তাঁহার প্রথম তিন কন্যার শিক্ষার জন্য যত ব্যয় করিয়াছেন, পুত্রদের এদেশীয় শিক্ষার ব্যয় তাহা হইতে অনেক কম করিয়াছেন। পুত্রদের বিলাতের শিক্ষার ব্যয় তিনি নিজে বহন করেন নাই, তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা করিয়াছেন, সুতরাং সে ব্যয়ের কথা ধর্ত্তব্য নহে।

অর্থ ব্যয় হইতেও পিতা মহাশয়ের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ অধিক হইয়াছে। আমাকে ছুটীতে বাড়ী লইয়া যাইতে ও পরে স্কুলে পৌছাইতে তাঁহাকে সময়ে সময়ে বড়ই কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে ছুটীর দরখাস্ত করিয়া উপরিস্থ জজের সঙ্গে চটাচটিও হইয়াছে। একবার বরিশাল হইতে আমাকে কলিকাতা পৌছাইবার জন্য বরিশালের তদানীন্তন জজের নিকট ছুটীর দরখাস্ত যখন নামঞ্জুর হইল, তখন তিনি হাইকোর্টে ছুটীর জন্য আবেদন করিলেন। এই আবেদন জজের হাতে দিলে তাহা প্রেরিত হইবে না, জানিতেন, সেই জন্য সরকারী নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া, স্বয়ং উহা প্রেরণ করিলেন। আবেদনে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণা কন্যার কলেজে যাইবার কথা ও দূর ও দুর্গম পথে পিতার সঙ্গে যাইবার আবশ্যকতা পরিষ্কার করিয়া লেখা ছিল। হাইকোর্টের জজেরা চির দিনই বেথুন বিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাঁহারা অবিলম্বে পিতা মহাশয়ের ছুটী মঞ্জুর করিয়া বরিশালের জজের নিকট হুকুম পাঠাইলেন, এবং দরখাস্ত খানি কেন উক্ত জজ সাহেবের হস্ত হইয়া আইসে নাই, তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। বলা বাহুল্য, স্থানীয় জজ ইহাতে পিতা মহাশয়ের প্রতি বিষম রুষ্ট হইলেন এবং অতঃপর সর্ব্বদাই তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটী গল্প মনে পড়িতেছে। আমাদের সন্তানগণের শুনিয়া আমোদ বোধ হইবে। যেবার আমি মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, সেই বার বেথুন স্কুল কমিটীতে পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে যখন কথাবার্ত্তা হইতেছে, তখন Justice Jackson জিজ্ঞাসা করিলেন, "কামিনী সেন কাহার কন্যা ?" দুর্গামোহন বাবু বলিলেন, "চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা।" প্রশ্ন কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "কোন চণ্ডী ? আমার চণ্ডী ?" এই সময়ে English Department, Justice Jacksonএর হাতে ছিল, সেই জন্যই তিনি পিতা মহাশয়কে 'আমার চণ্ডী' বলিলেন।

কিন্তু ইহার ভিতরে পিতা মহাশয়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ পাইতেছিল।

বরিশালের জজ কেন দরখাস্ত মঞ্জুর করেন নাই, তাহার একটি কারণ ছিল। পিতা মহাশয় তিন দিনের ছুটী চাহিয়াছিলেন; সঙ্গে এক রবিবার ও একটা কি পর্ব্ব উপলক্ষে একদিন কাছারী বন্ধ থাকিবে, সর্ব্বশুদ্ধ এই পাঁচ দিনের মধ্যে তিনি কলিকাতা গিয়া ফিরিয়া আসিবেন, এই কথা জানাইয়াছিলেন। সেকালে খুলনা ও যশোহরের ভিতর দিয়া রেলের রাস্তা হয় নাই। নৌকা-যোগে পাঁচ দিনের কমে কলিকাতা আসা সম্ভব ছিল না। বাদাবনের ভিতর দিয়া আসিতে আসিতে আবার ভাঁটার সময় নৌকা কাদার ভিতরে হয়তো অর্দ্ধেক দিন অচল হইয়া থাকিত। জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "যেখানে যাইতে আসিতে দশ দিন লাগে, সেখানে পাঁচ দিনের ছুটীতে কিরূপে চলিবে?" পিতা মহাশয় বলিলেন, "আমি পাঁচ দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিব অঙ্গীকার করিতেছি, আপনি কেবল অনুমতি করুন।" জজ রাগিয়া উঠিলেন, এমন অসম্ভব কথা তাঁহার বিশ্বাস হইল না, ছুটী মঞ্জুর করিলেন না।

পিতা মহাশয় রাস্তা সংক্ষেপ করিবার জন্য অনেকটা বর্ত্তমান রেল ও ষ্টীমারের পথ ধরিয়াই আসিতেন, বরাবর নৌকায় আসিতেন না। বরিশাল হইতে খুলনা পর্য্যন্ত বড় নদী দিয়া আসিয়া, তথা হইতে সংকীর্ণতর পথে যশোহরের বস্থন্দিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত আসিতেন ও সেখানে নৌকা রাখিয়া ছেকড়া গাড়ীতে যশোহর গিয়া এক বেলা বিশ্রাম ও আহারাদি করিয়া লইতেন, এবং আবার ডাক গাড়ী নামধেয় এক অপূর্ব্ব ছেকড়া গাড়ীতে চড়িয়া যশোহর হইতে বনগ্রাম দিয়া চাকদহ ষ্টেশনে আসিতেন। চাকদহে ট্রেণে উঠিয়া শিয়ালদহ গিয়া নামিতেন, এবং আমাদিগকে স্কুলে পৌঁছাইয়া, সেই দিন কোন বন্ধু গৃহে আহার করিয়া, রাত্রের ট্রেণে আবার রওনা হইতেন। ইহাতেই দশ দিনের স্থানে পাঁচ দিনে যাতা-

য়াত সম্পন্ন হইত। কিন্তু ইহাতে পিতৃদেবের কষ্টের সীমা থাকিত না।

ইতিপূর্ব্বে আর একবার ১৮৭৬ সনের ডিসেম্বর মাসে পিতা মহাশয়ের সহিত পাঁচ দিনে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, সে যাত্রার কথা বেশ স্মরণ আছে এবং চিরদিন থাকিবে। আমি দশ বৎসর বয়সে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে গিয়া কেবল মাত্র ছয় মাস কাল তথায় ছিলাম। মিস এক্রয়েডের (Miss Akroyd) সহিত বেভারিজ সাহেবের (Mr. H. Beveridge, I.C.S.) বিবাহ হইয়া গেলে. আর ছয় মাস কাল সে স্কুল ছিল, পরে উঠিয়া যায়। মাতৃদেবী পীড়িত হওয়াতে ঐ ঘটনার পূর্ব্বেই পিতা মহাশয় আমাকে মানিকগঞ্জ লইয়া আসেন। এখানে পিতা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে গৃহ শিক্ষকের নিকট কয়েক মাস এবং পূর্ণ এক বৎসর কাল সম্পূর্ণতঃ পিতা মহাশয়ের নিকট পড়া শুনা করিতে হয়। এই বৎসরের শেষে অক্টোবর মাসে পিতা মহাশয় সপরিবার জন্ম স্থানে আসিলেন। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাতাঠাকুরাণী আর স্বগ্রামে গিয়া বাস করেন নাই। ইতি মধ্যে তাঁহার আর একটী কন্যা ও পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। পুত্রের জন্মের পরই পিতা মহাশয়ের ইচ্ছা হইল পৈতৃক ভিটায় নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিয়া পিতার নাম রক্ষা করিবেন। এই বাটী নির্ম্মাণ কালে তাঁহাকে অনেক কষ্ট ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। গ্রামবাসী জনৈক জমীদার ব্রহ্মজ্ঞানীকে দেশে থাকিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া, আমাদের নূতন আট-চালার চাল রাতারাতি স্থানান্তর করিয়া জলসাৎ অথবা অগ্নিসাৎ করিয়াছিলেন। পিতা মহাশয় আবার চাল করাইলেন এবং যাহাতে এইরূপ অত্যাচার না হইতে পারে তন্নিমিত্ত বিচারালয়ে আবেদন করিলে পর, আদালত এই ব্যক্তির নিকট ১০০০৲ টাকার মুচেলকা লইয়া এই ব্যক্তিকে শান্তি রক্ষা করিতে বাধ্য করিলেন।

এই বৎসরই বাথরগঞ্জে ভয়ানক ঝড় ও বন্যা হইয়া ভোলা, দক্ষিণ সাবাজপুর প্রভৃতি স্থানে বহু লোক ধনে প্রাণে নষ্ট হয়। আমার জন্মের কিছু দিন পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ আশ্বিনের ঝড়, এবং উক্ত ঘটনার দ্বাদশ বৎসর পরে আবার এই কার্ত্তিকের ঝড় উপস্থিত হইয়া লক্ষ প্রাণীর প্রাণ হরণ করে এবং শত শত গৃহে শোকের হাহাকার রাখিয়া যায়। ঝড়ের রাত্রে আমরা বাসণ্ডা গ্রামে নব নির্ম্মিত গৃহে শায়িত ছিলাম। ঝটিকার প্রকোপ দেখিয়া সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। বাড়ীর চাল একবার পুড়িয়া গিয়াছিল, মনে হইল এবার উড়িবে।

এক কথা হইতে অন্য কথায় আসিয়া পড়িলাম।

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রীগণ ও আর কয়েকটি নূতন ছাত্রী লইয়া, স্ত্রীশিক্ষানুরাগী, বদান্যবর দুর্গামোহন দাস ও আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের যত্ন ও অর্থ সাহায্যে ও অবলাবান্ধব নামে সুপরিচিত, সকল দুর্ব্বল জনের হিতৈষী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ ও অন্যবিধ আনুকূল্যে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই দুর্গামোহন বাবু ক্রমাগত পিতা মহাশয়কে পত্র লিখিতে ছিলেন যেন আমাকে শীঘ্রই স্কুলে পাঠান হয়। পিতা মহাশয় আমার দুই কনিষ্ঠা ভগিনী ও শিশু ভ্রাতার সহিত আমার মাতৃদেবীকে বাসণ্ডা গ্রামে রাখিয়া আমাকে বঙ্গ-মহিলা-বিদ্যালয়ে বোর্ডার করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা লইয়া আসিলেন। পিতা মহাশয়ের সহিত এই প্রথমবার দীর্ঘপথ একত্র বাহির হইলাম। মাতৃদেবী হইতে যে ছয় মাস দূরে ছিলাম, বড়ই কষ্ট বোধ করিয়াছি; যেমন মা তেমন আমি, পরস্পরের জন্য অনেক কাঁদিয়াছি। পিতার জন্য সেরূপ কোন কষ্ট বোধ করি নাই। অল্প বয়সের সন্তান বলিয়া আমার শৈশবে পিতা তাঁহার গুরু জনদের সমক্ষে আমার প্রতি কোন প্রকার যত্ন বা বাৎসল্য প্রকাশ

করিতে লজ্জা বোধ করিতেন, আমিও তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতাম না। অপরিচিত পিতা যে কয়েক দিন বাটীতে থাকিতেন, আমি মাতার শয়ন কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, ঠাকুর দাদার বক্ষঃ আরো দৃঢ় করিয়া আশ্রয় করিতাম। সুতরাং আত্মীয় স্বজনের অসাক্ষাতেও পিতা আমাকে ডাকিবার বা আদর করিবার অবসর পান নাই। সাত বৎসর পিতাকে ভীতি ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া, তৎপরে যখন একেবারে তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িলাম, তখন বৈর ভাব দূর হইল বটে, কিন্তু গূঢ়প্রবিষ্ট, দৃঢ় মূল ভীতি ভাব সহজে গেলনা। আমার আর সকল ভাই ভগিনীর প্রতি পিতৃদেবের যেরূপ বাৎসল্যব্যবহার ছিল এবং তাঁহার নিকট তাহারা যেরূপ নিঃসঙ্কোচে কথা বলিয়াছে ও আবদার করিয়াছে, আমার জীবনে সেরূপ কখনই হয় নাই। আমার সহিত পিতৃদেবের চিরকালই গুরু শিষ্য সম্বন্ধের ন্যায় একটী সুদূর ও সংযত ভাব ছিল। আমি কখন পিতার কোলে বসিয়াছি, বা তাঁহার স্নেহ-চুম্বন পাইয়াছি, এরূপ মনে পড়ে না। উত্তর কালে আমার বিকলাঙ্গ কনিষ্ঠ সন্তানটিকে তাহার আড়াই মাস বয়স হইতে দুই বৎসর কাল পিতা মহাশয় তাঁহার নিকটে রাখিয়াছিলেন। একদা এই শিশুর নানাপ্রকার অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া পিতৃদেব ওয়াল্টেয়ার (Waltair) হইতে আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,"তোমার শৈশবে আমি তোমাকে বড় অনাদর করিয়াছি, তোমার সন্তান তাহার শোধ লইতেছে, আমি তোমার প্রাপ্য compound interest সহ পরিশোধ করিতেছি।" সত্য সত্যই এই শিশু সম্বন্ধে তিনি আশ্চর্য্য স্নেহ, স্বপ্রকৃতির বিপরীত ধৈর্য্য ও নারীসুলভ সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন।

আমার দ্বাদশ বৎসরে বাসণ্ডা হইতে কলিকাতা যাত্রার কথা বলিতেছিলাম। সেই কথাই এখন বলি। পথে আমি মাতার জন্য কাঁদিয়া অস্থির হইতাম। পিতা মহাশয় আমাকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইতে

চেষ্টা করিতেন। প্রায় সমস্ত ক্ষণই নানা সদ্‌গ্রন্থ হইতে বিশিষ্ট অংশ পড়িতে দিতেন এবং তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতেন।

স্কুলে গিয়া পাছে আমার রুচি ও অভ্যাস তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুরূপ না হয়, এই ভয়ে যেন সর্ব্বদা ভীত ছিলেন। এই কয়েক দিন সাজসজ্জা ও বিলাসিতা, বাহিরের সভ্যতা ও আড়ম্বরের বিরুদ্ধে কথায় যতদূর সাবধান করা যায় তাহা করিতে ত্রুটী করেন নাই। স্কুলে কিরূপ ব্যবহার করিব; পাঠাদিতে অধিক অনুরক্ত ও খেলা গল্প ও লঘু আমোদের বিরোধী দেখিয়া, সমবয়স্কারা বিদ্রুপ করিলে,তাহাদিগকে কি বলিব; এবং আপনার মনকেই বা কি বলিয়া দৃঢ় রাখিব এ সকল কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের এক খানি নোট বুক ছিল, তাহা বাহির করিয়া আমাকে দিয়া লিখাইলেন—

My life mission is higher than that of my school companions.—আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমার সহপাঠিনীদিগের অপেক্ষা উচ্চতর।

এবং এই কথাই সর্ব্বদা মনে রাখিতে অনুরোধ করিলেন। এই চিন্তাটি আমার মনে মুদ্রিত করিয়া, অত্মাভিমান বা অহঙ্কার নহে, কিন্তু জীবনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব জ্ঞান উন্মেষ করিয়া দেওয়াই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। আমি সবিশেষ চিন্তা না করিয়া, বিনা বাক্য ব্যয়ে, তাঁহার আদেশ মত কথাটি লিখিয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু উহা আমার বাল্য ও যৌবনের সকল সুখের কণ্টক হইয়া আমাকে কেবলই যন্ত্রণা দিয়াছে। দুঃস্বপ্নের মত এখনও মাঝে মাঝে উহা আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য পীড়া দিয়া যায়।

জলপথে পিতা মহাশয় স্বহস্তে রন্ধন করিতেন, কারণ আমাদের সঙ্গে কোন ভৃত্য ছিল না। এ পর্য্যন্ত রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিতে পিতার অনুমতি পাই নাই বলিয়া রন্ধন কার্য্যে একান্ত অপটু ছিলাম। স্কুলে আসিয়া সঙ্গিনীদিগের সহিত প্রথম তরকারী কুটিতে ও রাঁধিতে শিখি।

আমার সুশিক্ষা বিধান ও চরিত্র গঠন বিষয়ে পিতা মহাশয়ের সজাগ ভাবের আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

আমাকে কলিকাতা রাখিয়া মানিকগঞ্জ ফিরিয়া গিয়া, Lila Ada নামে এক ইহুদী বালিকার জীবন বৃত্তান্ত কোথায় পড়িয়াছিলেন। তাহার দৈনন্দিন লিপিতে আত্মচরিত্র গঠনোপযোগী কুড়িটি কি বাইশটি প্রতিজ্ঞা ছিল, সে গুলি অবিলম্বে নকল করাইয়া আমাকে চিঠীর ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন। সময়াভাবে স্বহস্তে অতটা লিখিতে পারেন নাই বলিয়া গৃহাগত কোন ব্রাহ্ম অতিথির দ্বারা উহা লিখাইয়া লইয়া ছিলেন। উক্ত লেখক পরে উদ্ধৃত অংশ অনুবাদ করিয়া ঢাকার বঙ্গবন্ধু কাগজে উহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন, পিতা মহাশয় তাহার ও এক কাপি আমাকে পাঠাইয়া ছিলেন।

এই সময়ে ঢাকা হইতে কোন কোন ব্রাহ্ম পিতা মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলেন। তাঁহারা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতানুবর্ত্তিরূপে ইংরাজী ধরণের বোর্ডিং স্কুল ও স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের কুশিক্ষার উদাহরণ স্বরূপ একদিন বলিয়াছিলেন যে তথাকার ছাত্রীরা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারকদিগের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি প্রকাশ করেন না, বরঞ্চ উপহাস করেন। কথাগুলির কোন মূল ছিল কি না জানি না। কিন্তু একথা শুনিয়াই পিতা মহাশয় আমাকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া এক পত্র লিখিলেন, এবং বুঝাইলেন যে, মহাত্মা কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুগামী প্রচারকগণ ভক্তির পাত্র ও নমস্য, কদাপি উপহাস্য নহেন। আমি ইতিমধ্যে উচ্চ প্রাথমিক (Upper Primary) পরীক্ষায়, প্রেসিডেন্সি সার্কেলে প্রথম স্থানীয় হইয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক দুই টাকা বৃত্তির স্থলে,কেবল ১০৲টাকা মাত্র পুরস্কার পাইয়াছিলাম ;—দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্রী, বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের বালিকারা অনেকগুলি বৃত্তি অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া, কোন ইন্‌স্পেক্টর এই ব্যবস্থা

দিয়াছিলেন। পিতা মহাশয়, পূর্ব্বোক্ত পত্রে, এই দশ টাকা ব্রাহ্ম প্রচারকদিগের সাহায্যার্থ দান করিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। দুঃখের বিষয় পত্র পাইবার পূর্ব্বেই আমার শিক্ষয়িত্রী ৭৲ টাকা দিয়া আমাকে দুই খানি বই কিনিয়া দিয়াছিলেন এবং বাকী ৩৲ টাকা আমি দুর্ভিক্ষে দান করিয়াছিলাম। পিতা মহাশয় শুনিয়া লিখিলেন, "তোমার যত বই লাগে আমি কিনিয়া দিব, তোমার নিজের টাকা সে জন্য খরচ করিবার আবশ্যকতা ছিল না।" আমাকে তিনি যেমন পুস্তক কিনিয়া দিতে পারিতেন, সেইরূপ তিনি প্রচার ভাণ্ডারেও দান করিতে পারিতেন এবং যথাসাধ্য করিতেন ও,কেবল আমার হৃদয়ে প্রচার কার্য্যের জন্য সহানুভূতি ও দানের ইচ্ছা জাগ্রত করিবার অভিপ্রায়েই ঐরূপ লিখিয়াছিলেন। অথচ প্রচারকগণের অগ্রণী মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধীয় মতকে অনুদার বলিতে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন না। বৎসরকাল পূর্ব্বে মানিকগঞ্জেই একদিন বলিতেছিলেন,"কেশব বাবু বলেন, মেয়েদের গণিত শিখাইবার আবশ্যক নাই, আর Logic বা ন্যায় শাস্ত্র না শিখাইয়া বরং Rhetoric অর্থাৎ অলঙ্কার শাস্ত্র শিখাইলে লাভ আছে। কিন্তু এটা বড় ভুল। গণিত ও ন্যায় শাস্ত্র না পড়িলে বুদ্ধি পরিষ্কার হইবে কিসে ?"

মনোবৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন ও জ্ঞান জনিত বিমল আনন্দ সম্ভোগ এই দুই উদ্দেশ্যে তিনি কন্যাদিগের পক্ষে জ্ঞান বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। তাহাদিগের জন্য অর্থকরী বিদ্যার আবশ্যকতা তিনি বহু কাল স্বীকার করেন নাই। কন্যারা চাকরী করে, বা চিকিৎসাদি ব্যবসার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে, তাহা ইচ্ছা করিতেন না। ডাক্তারী শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ অমত ছিল। যখন দুর্গামোহন দাস মহাশয়, ১৮৮২ সনে, তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যাকে ডাক্তারী শিখাইবার জন্য মান্দ্রাজ প্রেরণ করেন, তখন পিতৃদেব এই পুরাতন বন্ধুর বহু অনুরোধ ও আমার একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও আমাকে তথায় পাঠাইতে

সম্মত হইলেন না। দুর্গামোহন বাবুকে কি লিখিয়াছিলেন জানি না। আমাকে লিখিলেন, "আমার কন্যারা ডাক্তারী ব্যবসায় করিবে না।" সান্ত্বনাচ্ছলে আর একটু লিখিলেন—"তাহারা শরীরের চিকিৎসক না হইয়া মনের চিকিৎসক হইবে, গৃহে বসিয়া সদ্‌গ্রন্থ রচনা করিবে।"

তিনি মহারাজ নন্দকুমারাদি লিখিয়া গবর্ণনেণ্টের অপ্রীতিভাজন হন। ১৮৮৬ সনের আগষ্ট মাসে তাঁহার promotion বা পদোন্নতির পরিবর্ত্তে তাঁহার নিম্নস্থ কয়েকজনকে তাঁহার উপরে তুলিয়া দেওয়া হয়। তিনি ইহাতে আপনাকে অযথা দণ্ডিত ও অপমানিত বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ পদত্যাগের পত্র পাঠাইয়া দিলেন। ঠিক এই সময়ে বেথুন কলেজের ইংরাজ Lady Superintendent Miss Lipscombe বিবাহ করিয়া চলিয়া যান, কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এম, এ, অস্থায়ী ভাবে Lady Superintendent নিযুক্ত হন এবং চন্দ্রমুখী বসুর স্থান পূর্ণ করিবার জন্য পিতৃবন্ধু দুর্গামোহন বাবু ও পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বেথুন কমিটীর এই দুই সভ্য আমাকে বিশেষ ভাবে আহ্বান করেন। আমি এই পদ গ্রহণে পিতৃদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। তিনি তখন কৃষ্ণনগরে, আমি কলিকাতায়। চিরদিন স্বচ্ছল অবস্থার মধ্যে সযত্নপালিতা কন্যাকে পাছে দারিদ্রকষ্ট ভোগ করিতে হয় এই ভয়ে পিতা যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—"তোমাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছি, চাকরী করিয়া খাইবে বলিয়া নহে। তুমি চাকরী করিবে একথা আমার মনে করিতেও ক্লেশ হয়। কিন্তু আমি নিজে চাকরী ছাড়িয়াছি, এতকাল তোমাকে যে ভাবে রাখিয়াছি, আর সে ভাবে রাখিতে পারি, এমন সাধ্য হইবে না; তোমার কোন অভাব দেখাও কষ্টকর হইবে। কাজেই আর তোমার চাকরী করা সম্বন্ধে আপত্তি করিতে পারিতেছি না। তুমি নিজের আয়ে অন্ততঃ নিজের অভাব সকল দূর করিতে পারিবে।"

আমি শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিলাম। এদিকে বন্ধুগণের পরামর্শে ও আমার মাতাঠাকুরাণীর অনুরোধে পিতা পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিলেন। কিছুকাল পরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বস্থানে উন্নীত করিয়া দিলেন। চারি বৎসর পরে ১৮৯০ সনে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার দৃঢ় নির্ব্বন্ধতা. আমার ইচ্ছা এবং দুর্গামোহন বাবুর অনুমোদন এই তিন শক্তির একত্র সম্মিলনে ডাক্তারী শিক্ষা সম্বন্ধে পিতা মহাশয়ের ভয় ও কতগুলি সংশয় মন্দীভূত হয় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি আমার ভগিনী যামিনীকে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইতে অনুমতি দান করেন। একাজের জন্য তাঁহাকে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হয় নাই। আমার অপর সহোদরা প্রেমকুসুমও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেথুন কলেজ, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও এলাহাবাদ] Crossthwaite Girls' Schoolএ শিক্ষকতা করেন।

'লঙ্কাকাণ্ড' যখন মুদ্রিত হয়, তখন রমেশচন্দ্র দত্ত, বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে পিতা মহাশয়ের বাসায় আসিয়া সাহিত্যাদি বিষয়ে আলাপ করিতেন এবং আমার মাতৃ ঠাকুরাণীর স্বহস্তকৃত পিষ্টকাদি পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করিতেন। লঙ্কা কাণ্ডে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে দেখিয়া এবং উহা পিতা মহাশয়েরই রচিত এই অনুমান করিয়া, তিনি পিতা মহাশয়ের বাসায় আসিয়া তাঁহার সব পুস্তকের আলমারী দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পুস্তক গুলির শক্ত মলাট ছিল না বোধ হয় সেই জন্যই আলমারীতে স্থান পায় নাই। দত্ত মহাশয়ের ঐ বই একখানিও পাইলেন না, কিন্তু পরামর্শ দিয়া গেলেন যেন বইগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। তখনকার দিনে ঐ বই প্রজা বা রাজা কোন পক্ষের অসদ্ভাব উৎপাদন করিত এমন মনে হয় না। উহাতে হাস্যোদ্দীপক বিদ্রূপ ছিল, বিদ্রোহভাবের উদ্দীপক কিছুই ছিল না। আমি কলিকাতায় ইহার কয়েকখণ্ড লইয়া

আসি, তৎকালে জনকতক রসজ্ঞ কৃতবিদ্য লোক উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। পিতা মহাশয় পুস্তিকা খানি নষ্ট করেন নাই, প্রচার করিয়া ছিলেন, কিন্তু উহা এখন আর পাওয়া যায় না। সাময়িক ঘটনাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া, একালে সকলের পক্ষে উহার রসবোধ সম্ভব নহে।

স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেন।

স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেন

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২০এ এপ্রিল, বাঙ্গালা ১২৮৩ সনের ৯ই বৈশাখ তারিখে, ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জে যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। তৎকালে পিতা মহাশয় ঐ স্থানের মুন্‌সেফ ছিলেন। উপর্য্যুপরি আমরা তিনটী কন্যা জন্মিয়াছিলাম, এ জন্য তিনি ও মাতা ঠাকুরাণী একান্ত মনে একটী পুত্র সন্তান কামনা করিতে ছিলেন। এই সন্তানের জন্মে তাঁহাদের ও আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। এখন পর্য্যন্তও সেই আনন্দস্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল ভাবে জাগিতেছে। সে কি আনন্দ, কি উৎসব! পিতা মহাশয় স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের গৃহে গৃহে সন্দেশাদি মিষ্ট দ্রব্য প্রেরণ করিলেন, নিকটস্থ গ্রাম সমূহে লোক প্রেরণ করিয়া শত শত দরিদ্রকে আহ্বান পূর্ব্বক বহু যত্নে, পরিতোষ বিধানে ভোজন করাইলেন। এক প্রধান জ্যোতিষী পণ্ডিতের দ্বারা প্রাচীন প্রথানুসারে নবজাত শিশুর পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ এক জন্ম পত্রিকা লিখিত হইল। হইাতে শিশুর ভবিষ্যৎ মহত্ব ও দীর্ঘ জীবনের কথা সূচিত ছিল। ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে শিশুর জাতকর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদন করিবার জন্য ঢাকা হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ আহূত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত একত্র উপাসনা কীর্ত্তন ও সদালোচনায় কিছুকাল আনন্দে অতিবাহিত হইল।

ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি যতীন্দ্রমোহন পিতা মাতা আত্মীয়স্বজন এবং ভৃত্যবর্গের অতিশয় আদর যত্ন পাইতে লাগিলেন। মফঃস্বলে হাকিমের ছেলে হইলে যে দোষ ঘটে, যতীন্দ্রমোহনের ও তাহা ঘটিল, অর্থাৎ তাহার

ইচ্ছা ও আবদার একটু অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইল। এদিকে পিতামহাশয় আপনার মনের মত করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ কল্পনা করিতে লাগিলেন, এবং কিসে সে আশানুরূপ শিক্ষালাভ করিয়া সংসারে একজন বড় লোক হইতে পারে, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি অল্পকালে অনেক শিখাইয়া তাহাকে নানা গুণে জ্ঞানে ভূষিত দেখিতে ইচ্ছা করিতেন; কাজেই স্বেচ্ছাপ্রবণ বালকের পক্ষে শাসন ক্রমে একটু কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল; উহা তাহার ভাল লাগিত না, উহাতে পড়া শুনায় মনোনিবেশ অধিক না হইয়া বরং অল্প হইতে লাগিল। আর একটী ফল এই হইল যে, পিতার প্রতি আন্তরিক ভক্তি সত্ত্বেও কার্য্যতঃ অনেক সময়ে অবাধ্যতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার উন্নতির জন্য পিতা মহাশয়ের চেষ্টা ও আনুকূল্য একটু কম হইলে হয়তো তাহার নিজের চেষ্টা আর একটু অধিক হইত। সকলের ধারণা হইল যে পড়া শুনায় বালকের কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। পরে দেখা গিয়াছে যে ইহা ঠিক নহে। জীবন চরিত ও ইতিহাস পাঠে যতীন্দ্রমোহনের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ইতিহাসের কথা মুখে মুখে বালক বালিকাদিগকে বলিবার তাহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়াছি। উচ্চাঙ্গের উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া তাহার শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও বেশ ছিল। নানা কারণে তাহার জ্ঞানানুশীলন পিতার আশানুরূপ হইতে পারে নাই। তাহার একটী কারণ এই যে বাল্যকাল হইতেই পরিবারের কতকটা ভার ও ভাবনা যেন আপনা আপনি আসিয়া তাহার স্কন্ধে পড়িয়াছিল। যে খাটিতে চায় তাহাকে সকলে খাটায়; আমরাও তাহাকে খাটাইয়াছি; এ সম্বন্ধে আর কোন আইন নাই। আমাদের কনিষ্ঠ হইলেও বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া যতীন্দ্রকে, আগে পিতার অনুপস্থিতিতে এবং পরে তাঁহার সম্মুখে, পরিবারের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যে বয়সে বালকেরা পড়া শুনা বাদে কেবল খেলিয়া বেড়ায়; সংসারের কোন ধারই ধারে না,

সেই বয়স হইতে অতিরিক্ত আদরে বর্দ্ধিত স্বেচ্ছাপ্রবণ এই বালক মাতা, ভগিনী ও ভ্রাতাদের জন্য আপনার সুখ সুবিধা উৎসর্গ করিতে শিখিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আর একটী কারণ এই যে পুস্তকগত জ্ঞান হইতে কর্ম্মগত জ্ঞানের দিকে তাহার আকর্ষণ অধিক ছিল। এতৎসম্পর্কে তাহার পর্য্যবেক্ষণ ও অভিনিবেশ যথেষ্ট ছিল; শিক্ষা ও সাহায্য পাইলে তাহার মানসিক শক্তি সকল এই বিশেষ দিকে বিকশিত হইতে পারিত সন্দেহ নাই। সৌন্দর্য্য বোধ, সৌন্দর্য্য প্রিয়তা ও শিল্পানুরাগের পরিচয় তাহাতে অনেক প্রকারে পাওয়া যাইত।

যাহা হউক, যতীন্দ্রমোহন বি, এ পর্য্যন্ত পাশ করিয়া ছিলেন। কয়েক-বার বি, এল পরীক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। পড়া শুনা হইতে বৈষয়িক কার্য্যে তাঁহার মনোনিবেশ অধিক হইত। এই বাড়ীখানি (৯৮ বেলতলা রোড) তাঁহার স্মৃতিতে পূর্ণ। ১৯।২০ বৎসর বয়সে কেবল নিজের তত্বাবধানে এই বাড়ী খানি তিনি নির্ম্মাণ করাইয়া-ছেন। কত রৌদ্র তাঁহার অনাহার ও অল্পাহার ক্লিষ্ট শরীরের উপর দিয়া গিয়াছে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাঁহাকে কি দুরন্ত পরিশ্রমই এজন্য করিতে হইয়াছে। এ গৃহের এমন একখানি ভাল আসবাব নাই যাহা যতি নিজে বাজার ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাছিয়া কিনিয়া আনেন নাই। কেবল এ বাড়ীর জন্য ও এ পরিবারের জন্যই খাটিয়াছেন, তাহা নহে, অন্যের জন্যও যতীন্দ্র অনেক শ্রম করিয়াছেন, অনেক সময় দিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য যেখানে আবশ্যক হইয়াছে তিনি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; বাহুল্য ভয়ে এক একটী করিয়া তাহার উল্লেখ করা গেল না।

পরের চাকরী না করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের ইচ্ছা প্রবল ছিল, এই জন্য চৌরঙ্গীতে দোকান দিয়াছিলেন। এই দোকানই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ হইল। এই দোকান স্থায়ী ও লাভজনক করিবার জন্য দিবা রাত্রি কঠিন পরিশ্রম করিয়াছেন। বেলা ৯টার সময়

অল্প কিছু আহার করিয়া যাইতেন, ৭টার পূর্ব্বে ফিরিতেন না; রাত্রেও চিন্তা ও শ্রমের বিরাম ছিল না। অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফলে শরীর ভাঙ্গিয়া আসিল, জ্বর হইতে লাগিল, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। জ্বর লইয়া স্নানাহার করিতেন ও নিয়ম মত দোকানে যাইতেন। মানুষের শরীরে কত সহ্য হয়, ক্রমে রোগ দৃঢ় হইল, শরীরের বল মনের শক্তি পরাজয় মানিল; তিনি যখন আর উঠিতে পারেন না, তখন শয্যাশায়ী হইলেন। ডাক্তারেরা স্থান পরিবর্ত্তন পরামর্শ দিলেন। কত অনিচ্ছার সহিত প্রথমবার কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। প্রথম কিছু দিন গিরিধি, পরে ওয়ালটেয়ার ও অবশেষে নেপালে গিয়াছিলেন। ওয়ালটেয়ারে জানা গেল তাঁহার Pleurisy হইয়াছে। এই রোগের ক্রমিক বৃদ্ধিতে গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ই তারিখ শনিবার সন্ধ্যাকালে তাঁহার জীবন-লীলা শেষ হইল।

গত বৈশাখ মাসে মহা সমারোহে কুমিল্লা সহরে ত্রিপুরার রাজার দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যার সহিত যতীন্দ্রমোহনের বিবাহ হয়। বৎসর না ঘুরিতে নববধূ বৈধব্য প্রাপ্ত হইলেন। নূতন ঘর গড়িতে না গড়িতে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পিতা মাতার প্রতি যতীন্দ্রমোহনের গভীর ভক্তি ছিল। তাঁহার বিবাহিত জীবন বেশী দিনের ছিল না, তবু বাঁচিয়া থাকিলে তিনি কিরূপ গৃহস্থ হইতেন, তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বলিতেন, "এ গৃহের যিনি একতা রক্ষা করিতে পারিবেন এমন বধূ চাই।" বিবাহের পর ভাই ভাই পৃথক্ হয় তাহা ইচ্ছা করি না। বাস্তবিক পারিবারিক বন্ধন পূর্ব্বকালের মত অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা তাঁহার প্রত্যেক কাজে প্রকাশ পাইত। রোগ শয্যায় শুইয়াও নববধূকে গৃহে শান্তি ও প্রীতি রক্ষার উপায় সর্ব্বদা বলিয়া দিতেন। বলিতেন, "তুমি সর্ব্বদা আত্ম-বিস্মৃতি ও নিস্বার্থতা সাধন কর। ইহাতে তোমার

যদি সুখ সুবিধা নষ্ট হয়, হউক।” -“তুমি কেবল আমার জন্য খাটিয়া সুখ বোধ কর, ইহা ঠিক নহে, সকলের জন্য খাটিতে হইবে। দিবা রাত্রি খাটিয়া তুমি যদি অসুস্থ হও, তাহাও ভাল।” মাতার সেবায় পত্নীর একটু ক্রুটি হইলে বড়ই মর্ম্মপীড়িত হইতেন। তাঁহার সুশীলা পত্নীর এ বিষয়ে যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রুটি হইত তাহা নহে, তাঁহার সেবা করিয়া অন্যের সেবায় তাঁহার সময়ের অভাব ঘটিত। স্বামীর জন্য ব্যস্ততাবশতঃ তিনি তাড়াতাড়ি শাশুড়ীর কাজে যাইতে পারিতেন না। রোগ শয্যায় শুইয়া অনেক দিন বলিয়াছেন, “মার আহারের পর তাঁহাকে পান ছেঁচিয়া দিবার কথা, আমার রোজ মনে হয়, তোমার হয় না কেন?” তিনি বৃদ্ধা মাতাকে কোন কাজে যাইতে দিতে চাহিতেন না। পুত্রবৎসলা জননী পুত্রের জন্য কিছু করিতে পারিলে সুখ বোধ করিতেন,কিন্তু পুত্র তাহাতে অস্থির হইয়া উঠিতেন। “মা, তুমি আমার জন্য রাত্রি জাগিবে তো এই আমি উঠিয়া বসিলাম।” মাতা নিরস্ত হইয়া শয্যায় যাইতেন। নিজের আসন্ন মৃত্যুর বোধ হয় আভাস পাইয়া ছিলেন, তাই পত্নীকে বলিয়া গিয়াছেন, “আমার মৃত্যুর পর আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন তাঁহাদের নিকট থাকিয়া তাঁহাদের সেবা করিও, তাহার পরে ইচ্ছা হয় পিত্রালয়ে গিয়া থাকিও।”

যতীন্দ্রমোহনের বড় “শুচিবায়ু” ছিল। সকলের হাতে খাইতে পারিতেন না, সকল স্থানে বসিতে পারিতেন না, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা দেখিলে বিরক্ত হইতেন, অথচ রোগীর সেবায় কখন ক্রুটি হয় নাই।

অতিথি সেবাতে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। এখন আমাদের মধ্যে পূর্ব্বকালের মত অতিথি সেবা নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন।

বাহিরের লোকের সহিত যতীন্দ্রমোহনের ব্যবহার সৌজন্য,অমায়িকতা ও উদারতা পূর্ণ ছিল। একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত কোন কার্য্যানুরোধে আমার কথাবার্ত্তা হইতেছিল; আমি কি কাজ চাই

তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া পরে বলিলাম, "কাজ যাহা আমি করাইব, টাকা কড়ির কথা আমার ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে আপনি ঠিক করিবেন।" ভদ্রলোকটীর মুখ যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, যেন অপরিচিত স্থান পরিচিত হইয়া উঠিল, বলিলেন "তাঁহার সহিত একদিন আমার আলাপ হইয়াছে, তিনি বড় অমায়িক ভদ্রলোক।"

ন্যায়পরতা ও দেনা পাওনা সম্বন্ধে এমন পরিষ্কার আচরণ আমি অল্প যুবকেরই দেখিয়াছি। কাহারও এক পয়সা পাওনা থাকিলে তাহা ভুলিতেন না। নিতান্ত আপনার লোকের কাছেও যদি প্রয়োজন বশতঃ সামান্য কিছু লইয়াছেন, তাহা আবার পরে কড়ায় ক্রান্তিতে শোধ করিয়াছেন; যাঁহাকে দিয়াছেন তিনি হয়তো না লইতে হইলেই সুখী হইতেন, এবং লইতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন, কিন্তু যতীন্দ্রমোহন এমন ছেলে ছিলেন না যে কাহারও কাছে ঋণী থাকিবেন।

বিপন্নকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। পাঠ্যাবস্থায় এবং পরেও পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে এবং কখনও বা তাঁহাদের অনিচ্ছায় অনেককে টাকা ধার দিয়া বিপদ মুক্ত করিয়াছেন।

যতীন্দ্রের মুখের কথায় বা চিঠির ভাষায় তাঁহার স্নেহশীল হৃদয়ের পরিচয় কেহ পায় নাই। বরং তাঁহার মনে মুখে চিরদিন বিরোধ ছিল। যাহাকে বেশী ভালবাসিতেন তাহার সহিত বেশী আবদার করিতেন, কথায় কথায় অভিমান ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন, ইহা যে সর্ব্বথা কৃত্রিম তাহা বুঝিতে দিতেন না। আপনাকে ভুল বুঝাইয়া যেন একটু আমোদ অনুভব করিতেন। এই জন্য প্রিয়জনকে অনেক সময় অসুখী করিয়াছেন এবং ফলে আপনিও অসুখী হইয়াছেন। এই একটী তাঁহার ত্রুটি ছিল, অন্যথা তাঁহার জীবন নিস্বার্থতা, বিলাসহীনতা ও পরিশ্রমশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল। যাহা কিছু করিয়াছেন পরিবারের জন্য বা অপরের .ন্য করিয়য়াছেন। নিজে ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল থাকিব, সভ্য

সমাজে গিয়া দশজনের এক জন হইয়া বসিব, এভাব এক দিনের জন্যও তাঁহাতে দেখি নাই। এই বয়সেই সাদা ধুতি ধরিয়াছিলেন। কবে পাড়ওয়ালা ধুতি পরিতেন যেন মনেই পড়ে না।

প্রার্থনাশীলতা তাঁহাতে ছিল। প্রতিদিন ঈশ্বর স্মরণ করিয়া উত্থান করিতেন, প্রতিদিন কর্ম্মস্থানে যাইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়া যাইতেন। পত্নীর নিকট বলিতেন, "যখনই ভাবনা চিন্তাও বিপদ আসিয়াছে, প্রার্থনা করিয়াছি, প্রার্থনার পর সকল বিপদ যেন কাটিয়া গিয়াছে।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সৌন্দর্য্য বোধ ও সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই সৌন্দর্য্য কেবল মানুষের দেহে, প্রকৃতির মুখে, শিল্পে ও সাহিত্যেই দেখিতেন, তাহা নহে, মানব চরিত্রে এই সৌন্দর্য্য খুজিতেন ও পাইলে তাহার পূজা করিতেন। নেপালে থাকিতে তথাকার কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলার গুণ কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে এক দিন কোনও ভদ্র লোকের নিকট তাঁহার গুরুতর নিন্দার কথা শুনিলেন। ইহাতে তিনি এমন মর্ম্মাহত হইলেন,যে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আমি কেন নেপালে আসিয়াছিলাম? আমার ইচ্ছা হইতেছে আমি এখনই এদেশ হইতে চলিয়া যাই।" ভদ্রলোকটী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আপনার মনে এত আঘাত লাগিবে জানিলে আমি একথা আপনাকে কখনও শুনাইতাম না।"

কোনও বন্ধুকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেন। ঘটনাচক্রে এই বিশ্বাস ভঙ্গ হয়, ইহাতে তাঁহার সরল স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে যে কি আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। ক্রমে এই ব্যথার তীব্রতা দূর হইল, তখন ধীরভাবে তাহার আচরণের সমালোচনা করিতেন এবং জীবনসংগ্রামে পড়িয়া মানুষের নৈতিক আদর্শ খর্ব্ব হয় বলিয়া তাহার দোষ ক্ষালন করিতেন।

পরশ্রী কাতরতা তাহাতে ছিল না বলিলে যথেষ্ট হয় না, তাঁহার পক্ষে

উহা অসম্ভব ছিল। ব্যবসায়িগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব প্রবল হইয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ আনয়ন করে, একে অপরের ক্ষতি করিবার জন্য প্রয়াস পায়। তিনি কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, "অমুকের ভাল হইলে আমার কিছু দুঃখ নাই, যাহার ভাল হয় হউক, আমার ক্ষতি না হইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

অসম্পূর্ণ জীবনের প্রায় সকলই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবনের সদ্‌গুণ সকল পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবার যথেষ্ট অবসর পায় নাই। আশা ও আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। তাঁহার প্রাণের কতকগুলি গভীর ভাব তিনি যত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছেন; অতি অল্পই আমরা ধরিতে পারিয়াছি। আমরা পরিবারস্থ এবং নিকটস্থ জনেরাও তাঁহার কৃত্রিম ক্রোধ ও অভিমানের দ্বারা প্রতারিত হইয়া, তাঁহার নিঃস্বার্থ নিরাসক্ত হৃদয় খানির দিকে সকল সময় চাহি নাই, তাঁহার সেবা লইয়াছি, পরিবর্ত্তে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা দিই নাই। রোগশয্যায় শুইয়া একদিন বলিয়াছেন, "আমার কিছুর জন্য আসক্তি নাই মরিতে আমার কোন কষ্ট হইবে না।" আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না এত শীঘ্র তাঁহাকে হারাইতে হইবে; কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, বুঝিয়া ভীত বা দুঃখিত হন নাই। শোকের মধ্যে ইহা বিশেষ সান্ত্বনা। বিশ্বজননীর ক্রোড়ে তাঁহার সকল শক্তি ও সকল সদ্বৃত্তি সার্থকতা লাভ করুক।

৯৮ বেলতলা রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা।
৫ই মার্চ্চ, ১৯০৬।

স্বর্গীয়া সরযূবালা ঘোষ।

সরযূবালা।

শৈশব

সরযূবালা রঙ্গপুরের বর্ত্তমান জজ্ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় ও পরলোকগতা সৌদামিনী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী, বাঁকীপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার শৈশব মূর্ত্তি যাহা মনে পড়ে, তাহা বড়ই মধুর। পিতার অতিশয় আদরের শিশু, যে কেহ কাছে ডাকে তাহারই নিকট নির্ভয়ে উপস্থিত হয়, মুখে একটু সলজ্জ হাস্য, বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুটি সরলতা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। আর একটু বড় হইলে পর এই বিশ্বাস ও নির্ভীকতার স্থলে তাহার চক্ষে মুখে একটু ভীরুতা প্রকাশ পাইত। ক্ষুদ্র বালিকা ঠাট্টা তামাসা বুঝিত না। কেহ তাহাকে কাপড় পরাইতে গিয়া একটি আলপিন দেখাইয়া বলিলেন, "এইটি তোমার গায়ে লাগাইয়া দিব।" বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে লাগাইবে? উত্তরে শুনিল, নোড়া দিয়া গায়ে ঠুকিয়া দিতে হইবে। আর বিলম্ব না করিয়া বালিকা রান্না ঘর হইতে নোড়া লইয়া আসিল।

সকলের অতিশয় আদরের হইলেও সরযূকে অনেক সময়ে অসাবধনতার ও বিশৃঙ্খলতার জন্য মাতার নিকট তিরস্কৃত হইতে দেখা গিয়াছে। এমন আগ্রহ ও ত্রাসের সহিত মাতার আদেশ পালন করিতে যাইতেন যে, প্রায়ই হিতে বিপরীত ঘটিত। অতি সাবধানে মাতার আয়না খানি আনিতে গেলেন, ত্রাস বশতঃই সে খানি হস্তচ্যুত হইয়া চূর্ণ

হইল। মাতাকে সন্তুষ্ট করিবার আশায় তাড়াতাড়ি কোন কাজ করিতে গেলেন, দৌড়াইতে দৌড়াইতে এমন আছাড় খাইলেন যে, সে কাজতো হইলই না, মাতার কাজ আরও বাড়িয়া গেল। স্নেহময়ী জননী কন্যার যে বিশৃঙ্খলতা ও অসাবধানতা দেখিয়া দুঃখিত ও চিন্তিত হইতেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে ত্রুটিগুলি একেবারে দূর হইয়া তাহার স্থানে যে শৃঙ্খলা, কার্য্যপটুতা ও সর্তকতা সরযূর চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতেন।

তাঁহার শৈশব ইতিহাসের আর একটা স্মরণীয় বিষয় গীত বাদ্যে তাঁহার রুচি। তাঁহার পিতৃবন্ধুগণ অনেকেই তাঁহার কোমলকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠ মিষ্ট ছিল, গান গাহিতে বলিলে ওজর আপত্তি না করিয়া যেমন পারিতেন সেইরূপ গাহিয়া বন্ধুবর্গকে সুখী করিতেন। অতি অল্প বয়স হইতেই বাধ্যতা ও অপরকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা তাঁহাতে সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছিল।

মাতৃ বিয়োগ

একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সরযূর মাতৃ বিয়োগ ঘটে। এই সময় হইতেই বালিকা গৃহিণীব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, একথা বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। এই সময় হইতেই তাঁহার আত্ম-নিগ্রহ ও পরসেবা শিক্ষার আরম্ভ। একটী একটী করিয়া মাতৃহীন পরিবারের প্রাত্যাহিক ঘটনা বিবৃত করিতে হইলে স্থানে কুলাইবে না। যাঁহারা কেদারনাথ রায়ের পুত্র কন্যাদিগকে মাতৃ বিয়োগের পর দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মনে অনেক কথা এখনও জাগিতেছে।

পত্নীর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই রায় মহাশয়ের বহুকালের এক বিশ্বস্ত পরিচারিকার মৃত্যু হয়। ইহাতে ছোট দুইটি শিশু চারুবালা ও

সত্যেন্দ্রের ভার প্রধানতঃ সরযূর হাতেই পড়ে। ইহার অল্প পরে সরযূর অগ্রজদ্বয় জ্ঞানেন্দ্র ও যতীন্দ্র শিক্ষার্থ বিলাত গমন করিলে পিতা কন্যা-ত্রয়কে শিক্ষার জন্য বেথুন স্কুলে বোর্ডিংএ রাখিতে বাধ্য হন। এখানেও সরযূ দিদির কর্ত্তব্যে শৈথিল্য করেন নাই।

পাঠ্যাবস্থা।

স্কুলে অবস্থান কালে তিনি নির্ব্বিরোধ স্বভাব, সরলতা, সত্যবাদিতা ও বাধ্যতা দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী সকলেরই স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বাল্যে পড়া শুনায় তাঁহার বুদ্ধি কিম্বা স্মরণ শক্তি খুব তীক্ষ্ণ ছিল না, কিন্তু অধ্যবসায় ও পরিশ্রম এবং অল্প বয়স হইতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অসাধারণ থাকায় তিনি যে কাজ ধরিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন করিয়া ছাড়িয়াছেন। স্মৃতিশক্তি প্রখর নহে, কিছু বুঝিতে অনেক বিলম্ব ঘটে, বাল্যকালে একথা বলিয়া অনেক দুঃখ করিতেন; কিন্তু অধ্যবসায়ের ফল দর্শন করিয়া ক্রমে আপনার প্রতি তাঁহার দৃঢ় নির্ভরের ভাব সঞ্জাত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধি শক্তিও বেশ তীক্ষ্ণতা লাভ করে।

সরযূ বেথুন স্কুলে থাকিয়া ১৮৯৭ সনে এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি এফ, এ, পড়িবেন এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন. কিন্তু সেই বৎসর মার্চ্চ মাসের শেষভাগ হইতে তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন; তজ্জন্য গ্রীষ্ম অবকাশের পর হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তিনি বেথুন স্কুলে ডেস্কলার (day scholar) থাকেন এবং তৎপরে প্রায় দুই বৎসর কাল ভ্রাতার সেবায় নিরন্তর ব্যস্ত থাকাতে পড়া শুনার চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

কিছুকাল পড়া শুনা ছাড়িয়া দিলে অনেকেরই পাঠাদিতে এমন

অনভ্যাস ও অরুচি জন্মিয়া যায় যে, আর তাহারা নিয়মিত অধ্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করিতে পারে না। সরযূর সেইরূপ ঘটে নাই। তিনি ৯৭ সনে এনট্রান্স দিয়া প্রায় তিন বৎসর পরে আবার এফ, এ, দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার বিবাহ ও বিলাত গমন ঘটে। যখন পুনরায় পড়া আরম্ভ করেন, তখন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার যথেষ্ট সময় ছিল না; কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারিবেতো?" বলিলেন, "পড়িলেই পারিব।" এই প্রসঙ্গে তাঁহার জ্ঞান পিপাসার আর একটু পরিচয় দিতে হইবে। বিলাতে গিয়া তিনি নিউনহাম কলেজে (Newnham College) পড়িবেন বলিয়া তথাকার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে ভালরূপ পড়িতে পারেন নাই এবং সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হন নাই। নূতন কিছু শিক্ষা লাভ হইল না, অতএব বিলাতযাত্রা মিথ্যা হইল, এই চিন্তা তাঁহাকে বড়ই কষ্ট দিত। তিনি সঙ্কল্প করিয়া গিয়াছিলেন, কিছু শিখিয়া আসিবেন। কি শিখিয়া আসিয়াছিলেন, পরে প্রকাশ পাইবে। বিলাত হইতে আসিয়া বলিয়াছেন, "এখনও যদি কলেজে গিয়া পড়িতে পারিতাম তো পড়িতাম। বেশী না পড়িলে কিছুই ভাল বুঝা যায় না। লোকে বলে, সাহিত্য লইয়া থাক। সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেও উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন।" সরযূ জ্ঞানের জন্য জ্ঞান খুজিতেন, উহাকে অন্য কোন উদ্দেশ্যের উপায় করেন নাই, কাজেই বিবাহের পর তিনি জ্ঞান লাভের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সরযূ সাধারণব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত নীতিবিদ্যালয়ের এক জন পুরাতন ছাত্রী। নীতি বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁহার সুস্বভাবের সাক্ষ্য দিবেন। নীতি বিদ্যালয়ে যে দিন নীতি বিষয়ক যে আখ্যায়িকা শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্কুলে অথবা গৃহে আসিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার সে খাতাখানি আজিও খুঁজিলে পাওয়া

যায়। কি বাজনায়, কি সঙ্গীতে, কি জ্ঞান-বিষয়ক, কি নীতি-বিষয়ক শিক্ষায় এমন আগ্রহ ও উন্মুখতা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ভাল কথা শুনা এবং পক্ষীর ন্যায় সে গুলি আবৃত্তি করা, কিছু কঠিন কাজ নহে, কিন্তু যে টুকু শিক্ষা পাওয়া যায়, সেটুকু জীবনে আয়ত্ত করাই সাধনা সাপেক্ষ। সরযূ যখন যে উপদেশ পাইয়াছেন, তাহা মনে রাখিয়া নীরবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সর্ব্বদা প্রয়াস পাইতেন।

ভ্রাতৃসেবা

এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সরযূ তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থান পাবনাতে আসিয়াছিলেন। ইহার আড়াই বৎসর পুর্ব্বে তাঁহার পিতা পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং গৃহ কর্ম্ম কিম্বা অন্য কোন কর্ম্মে ব্যস্ত হইবার তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিয়াই গৃহ কর্ম্মে এবং নবজাত ভগিনীর পরিচর্য্যায় সাহায্য করিতেন। যিনি সরযূ ও তাঁহার ভাই ভগিনীদের মাতৃপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তিনি সরযূর সরলতা ও সদ্ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ ছিলেন। বস্তুতঃ সরযূর প্রতি তাঁহার এবং তাঁহার প্রতি সরযূর চিরদিনই অকৃত্রিম সদ্ভাব ও ভালবাসা ছিল।

১৮৯৭ সনের মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে যোগেন পীড়িত হইল। সন্তান বৎসল পিতা পুত্রকে হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত দেখিয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। পাবনায় নানাপ্রকার চিকিৎসায় কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া, কলিকাতার সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তিনি কর্ম্ম বা কর্ম্মস্থান ছাড়িয়া যাইতে অসমর্থ, সমুদয় পরিবার কলিকাতায় রাখা বহুব্যয়সাধ্য, কাহার উপর প্রাণাধিক রুগ্ন পুত্রের ভার দিয়া তাহাকে কলিকাতায় রাখিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। কোন আত্মীয় এতৎ

সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "আমরা জানিতাম, মাতাই সন্তান স্নেহে উন্মাদিনী, কিন্তু এ গৃহে পিতা সন্তান বাৎসল্যে আত্মহারা।" কথাটিতে একটুও অত্যুক্তি নাই। তিনি সন্তানবাৎসল্যে আত্মহারা, কেবল তাহাই নহে, যে তাঁহার রুগ্ন সন্তানের সেবার ভার গ্রহণ করিবে সেও সম্পূর্ণ আত্মহারা হউক, তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন। অনির্দ্দিষ্ট ও অনিয়মিত খাটুনির উপর তাঁহার বিশ্বাস আদৌ নাই। অনন্য কর্ম্মা, অনন্য চিন্ত হইয়া কেহ যোগেনকে লইয়া থাকিতে প্রস্তুত না হইলে, তাঁহার মন প্রবোধ মানে না। এই অবস্থায় সরযূ যোগেনের ভার লইয়া কলিকাতা যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পড়া শুনার ক্ষতি হবে না?" সরযূ বলিলেন, "যোগেনের চেয়ে কি পড়া শুনা বেশী?"

কলিকাতা মাতামহের গৃহে অবস্থান কালে যোগেনের সেবায় সরযূর সমস্ত সময় নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা না হওয়াতে, তিনি কিছু দিন দৈনিক ছাত্রী (day scholar) রূপে কলেজে পড়িতেছিলেন, কিন্তু ডাক্তারগণ যোগেনকে কিছু দিন মধুপুরে রাখিতে পরামর্শ দেওয়ায় সরযূ সেপ্টেম্বর মাসে মাতার সহিত যোগেন ও তৎকনিষ্ঠ ভাই ভগিনীদিগকে লইয়া মধুপুর যাত্রা করেন। এখানে যোগেনের সেবা-শুশ্রূষার ভার তিনিই প্রধানতঃ বহন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ রোগীর অবস্থা লিপিবদ্ধ করিতেন, স্বহস্তে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঔষধ পথ্য বিধান করিতেন এবং রোগীকে সঙ্গে লইয়া দুই বেলা বেড়াইতে বাহির হইতেন। দ্বিপ্রহরে রোগীর পক্ষে নিদ্রা নিষিদ্ধ ছিল, তখন তাহাকে লইয়া খেলা করিতেন। ইহার ভিতরে ভিতরে শিশু ভগিনীকে লইয়া আমোদ করিতেও যথেষ্ট অবসর হইত। যাহারা বাড়ীতে আসিত, তাহাদের সহিত ভদ্রতা করিতে ত্রুটি হইত না। অসুস্থা মাতা পদ ব্রজে চলিতে সক্ষম ছিলেন না। যে সকল মহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, ভদ্রতার নিয়ম রক্ষার জন্য

সরযূ ছোট ভাই বোনকে লইয়া তাঁহাদের সহিত প্রতি সাক্ষাৎকার করিয়া আসিতেন। অথচ যে বিশেষ কর্ত্তব্য ভার পিতার নিকট গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে ভার যাহাতে সম্যক্ পালন করিতে পারেন, যাহাতে শুশ্রূষাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি, অনবধানতা বা শৈথিল্য না হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতেন। সরযূ কর্ত্তব্য পরায়ণা এবং অভিমানিনী ছিলেন, তাই যাহা করিতেন তাহা নিখুঁত করিতে চেষ্টা করিতেন। মধুপুরে তিন মাস অবস্থানের পরও রোগের উপশম না দেখিয়া, ডাক্তারগণ যোগেনকে এক মাস সমুদ্রে রাখিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। বাবু কেদারনাথ রায় পণ করিয়াছিলেন, চিকিৎসার ত্রুটিতে যোগেনকে মরিতে দিবেন না। তিনি তাহাকে সমুদ্র-যানে কলম্বো পাঠাইতে কৃতসংকল্প হইলেন, কিন্তু নিজে সঙ্গে যাইতে অক্ষম, কি করেন ভাবিতে লাগিলেন। এই সময়ে সরযূ সঙ্গে যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন এবং সরযূই সর্ব্বথা উপযুক্ত শুশ্রূষাকারিণী ও সঙ্গিনী সাব্যস্ত হইলেন। সঙ্গে একজন নিকট আত্মীয় বালকবালিকার অভিভাবকরূপে চলিলেন। জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া যোগেনের অবস্থা শঙ্কটজনক হইল। সে সময়ের কথা সেই আত্মীয় ব্যক্তির ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"জাহাজে এবং কলম্বো নগরে অবস্থান কালে সরযূ সকল শ্রেণীর লোককে অতি মধুর ব্যবহারে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। নানা শ্রেণীর লোকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, অথচ সর্ব্বত্র আত্মমর্য্যাদা এবং সম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মাতার অভাবে পিতার দ্বারা এরূপ সুশিক্ষা, অতি অল্প কন্যার ভাগ্যেই হইয়া থাকে। যে দিন কলম্বোর ইয়োরোপীয় হোটেলে যোগেনের জীবন সংশয় উপস্থিত হয়, সেই অবস্থায় সেই হোটেল হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আমরা কলম্বোর জেনারেল হাস্পাতালে আশ্রয় লই; সেই দিনকার সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং সাহস বাস্তবিকই আঠার বৎসরের বালিকার পক্ষে অতুলনীয়। সেই বিষম অবস্থার কথা

মনে করিতে এখনও প্রাণ আতঙ্কিত হয়। এক্ষেত্রে সরযূকে মূর্ত্তিমতী নির্ভীকতা ও সহিষ্ণুতারূপে দেখিয়াছিলাম।

"কলম্বো অবস্থানকালে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়. তন্মধ্যে তথাকার সিভিলিয়ান, রেজিষ্ট্রার জেনারেল মিঃ অরুনাচলম্ এবং তাঁহার পত্নী, বৌদ্ধ অনাথাশ্রম ও বৌদ্ধ বালিকা বোর্ডিং স্কুলের তত্ত্বাবধায়িকা মিসেস হিলিংস এবং মিলিটারী ডাক্তারের বিধবা পত্নী মিসেস বীটি ও টেক্‌নিকাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পত্নী মিসেস হিউম্যান, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক মাননীয় ধর্ম্মপাল এবং তাঁহার মাতা ও ভগিনীর অকৃত্রিম স্নেহ সরযূ লাভ করিয়াছিলেন। চিদাম্বোলাম ভ্রাতৃদ্বয় এবং পিটার ডি আব্রু ও মিঃ চণ্ডীরাম সরযূকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন।"

জেনারেল হাস্পাতালে দুইটি শুশ্রূষাকারিণী রোগীর সেবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। তাহা দেখিয়া সরযূর অভিলাষ হইয়াছিল যে, রোগীর সেবায় জীবনপাত করিবেন।

কলম্বো বাসকালে সরযূ প্রতি সপ্তাহে একবার পত্র ও দুইবার তার যোগে ব্যাকুল পিতাকে যোগেনের সংবাদ জানাইতেন। পত্র লিখিবার সময় তাঁহাকে অনেক বুদ্ধি খাটাইতে হইত। তাঁহার পিতা অল্পেই অস্থির হইয়া পড়েন, বিদেশ হইতে প্রত্যেক খুঁটি নাটি লিখিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া লাভ নাই, যথেষ্ট বিপদেরই সম্ভাবনা আছে, ইহা বুঝিয়া তিনি পত্রের ভাব ও ভাষাতে যথেষ্ট সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। অবস্থানুসারে যাহা কর্ত্তব্য, সকলই অবিলম্বে করিতেন ও করাইতেন, কিন্তু নিজের কার্য্য দ[illegible] বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কাহারও নিকট দিতে ব্যস্ত হইতেন না। অনেক কথা গোপন রাখিতেন. সে সকল পরে প্রকাশ পাইত। এমন কি, যে আত্মীয় ব্যক্তিকে অভিভাবকরূপে সঙ্গে পাঠান হইয়াছিল, তিনি অনেক সময় ভীত হইয়া নানাপ্রকার ভয়ের কারণ দেখাইতেন, কিন্তু তাহার পরে

আবার লিখিতেন যে সরযূ সুবুদ্ধি এবং সৎসাহসের সহিত কার্য্য করিয়া তাঁহাকে ও সাহসিক করিয়া তুলিয়াছেন।

এক মাসের জন্য যাইয়া প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল। আশার প্ররোচনায় পিতা তাঁহাদিগকে আরও কিছুকাল কলম্বো রাখিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা হাঁসপাতাল ছাড়িয়া আসিয়া, সমুদ্রের ধারে একখানি বাড়ী করিয়া রহিলেন, সরযূ গৃহিণীপণা করিতে লাগিলেন। গৃহিণীর কার্য্যে সরযূ সুদক্ষা ছিলেন। এই বিদেশেও চাকর খাটাইতে, আহারাদির বন্দোবস্ত করিতেও রুগ্নের পথ্য দিতে কোন দিন কোন ত্রুটি হয় নাই, কোন অসুবিধা বা বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। মাঝে মাঝে অতিথি সেবাও হইয়াছে। সমুদ্রের বাতাসে সাত মাস থাকিয়াও রোগ সারিল না। ইতিমধ্যে কৃতান্ত অতর্কিত পদে কেদারনাথ রায়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রথম পক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা অতি আদরের ধন চারুবালাকে হরণ করিয়া লইল। সরযূ মায়ের মত যত্নে আশৈশব চারুর তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, বিদেশে অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত আঘাত পাইলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু এই বেদনা অতি নীরবে বহন করিয়া, অতি ধীর ভাবে যোগেনের সেবা কার্য্যে রত রহিলেন। এক ঘণ্টার জন্যও যোগেনের

কলম্বো প্রবাস কালে তাঁহার অনেক বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, লোক চরিত্র অনেকটা বুঝিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পত্রাদি পড়িয়া এবং দেশে ফিরিলে প [illegible] ভ্রাতার সেবা কার্য্যে তাঁহার শি[illegible] কোন ব্যাঘাত জন্মিয়াছে মনে করা সম্পূর্ণ ভূল। প্রকৃত শিক্ষার্থী [illegible] জ্ঞান আহরণে সমর্থ হয়। "পুথিগত বিদ্যা" সাঙ্গ করিয়া এই জন্য পাশ্চা[illegible] প্রদেশে লোকে দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হয়।

যোগেনের পীড়ার উপশম না হওয়াতে তত্রত্য ডাক্তার সাহেবে[illegible]

উপদেশ মত সরযূ ভ্রাতাকে লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে আসিয়াও সেই নিরন্তর শুশ্রূষা চলিতে লাগিল। নবেম্বর মাসে সমুদয় পরিবার যোগেনকে লইয়া আবার মধুপুরে গেলেন। দুই মাস তথায় থাকিয়া সরযূর পিতার কর্ম্মস্থল বাঁকুড়ায় আসিলেন। রোগ যত পুরাতন হইতে লাগিল, সেবা কার্য্য তত কঠিন হইয়া আসিল। পিতার একমাত্র চিন্তা যোগেন, সরযূর একমাত্র ব্রত ডাক্তার কবিরাজের নির্দ্দেশ অনুসারে ঔষধ পথ্য দিয়া এবং নানা উপায়ে তাহার রোগ কষ্ট প্রশমিত করিয়া, নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন প্রদীপ প্রজ্জলিত রাখা।

কনিষ্ঠা ভগিনী প্রিয়বালা এবং বিলাত প্রত্যাগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্র নাথ রাত্রি জাগরণাদি কার্য্যে সাহায্য করিতেন। কিন্তু পিতার নিকট সকল বিষয়ে তিনিই দায়ী ছিলেন বলিয়া,অন্যকে দিয়া বেশী কিছু করাইতে চাহিতেন না; পিতাও আর কাহাকেও রুগ্নের ভার দিয়া তত নিশ্চিন্ত বোধ করিতেন না। ১৮৯৯ সনের ১৯এ জুলাই, যোগেন দিদিকে দীর্ঘ বিশ্রাম দিয়া, পিতার সকল আশা ও চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ক্রম কালে ভবলীলা সাঙ্গ করেন। সরযূ মাতার ন্যায় ধৈর্য্য ধরিয়া, ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া এতকাল যাহার পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহার বিয়োগ দুঃখ অতি ধীর ভাবে বহন করিলেন।

বিবাহের ও বিলাত যাত্রার উদ্যোগ।

নভেল নাটক পড়িয়া অনেক বালিকা অল্প বয়সে অত্যন্ত পাকিয়া যায়। বাল্যকালে সরযূ শিক্ষক বা অভিভাবকদিগের মত না জানিয়া কোন বই পড়িতেন না, এবং কোন দিন সমবয়স্কা দিগের সহিত বেশী মিশিতেন না, সুতরাং কুরুচি পূর্ণ আলাপাদিতেও যোগ দিতেন না। সেই জন্যই সংসারের অনেক বিষয়ে তিনি শিশুর ন্যায় অনভিজ্ঞ এবং নির্দ্দোষ ছিলেন। বিবাহের কথা অনেককাল তাঁহার মনে স্থান পায় নাই।

তাঁহার সপ্তদশ বৎসর অতিক্রমের পর কোন যুবক তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়া তাঁহার পিতার নিকট তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করেন। সরযূ সে কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি পড়াশুনা করিতেছি, আপনিও করুন, আমাদের বিবাহের সময় হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে এবিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে।" তখনও যুবক উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন না, এবং পাঠ্যাবস্থা সম্পূর্ণ শেষ করেন নাই। ভ্রাতার পীড়া বশতঃ একদিকে পড়া শুনা, অন্য দিকে বিবাহের প্রস্তাব উভয়ই স্থগিত থাকে। আর একটী কারণে সেই অল্প বয়সেই বুদ্ধিমতী বালিকা বিবাহ করিবেন কি না, সে বিষয়ে সংশয়াকুল ছিলেন। সেটি তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য। তাঁহার শরীরে কোন রোগ না থাকিলেও, অনেকে মনে করিত এবং তিনি নিজেও ভয় করিতেন যে, হয়ত বা তিনি জননীর রোগের উত্তরাধিকারিণী হইবেন। পিতার নিকট পত্রে লিখিয়াছেন, "আমার যেরূপ স্বাস্থ্য তাহাতে আমার বিবাহ করা উচিত হইবে কি না বুঝিতে পারিতেছি না।" যোগনের মৃত্যুর পর তিনি আবার জ্ঞানার্জ্জন এবং পিতা মাতা ভাইভগিনীর সেবা জীবনের লক্ষ্য করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, এফ, এ, পরীক্ষা দিয়া পরে মেডিকাল কলেজে গিয়া ডাক্তারি শিখিবেন। তিনি স্থির চিত্তে আবার এফ, এ, পরীক্ষা দিবেন বলিয়া অধ্যয়নাদিতে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পিতার মন সুস্থির হইল না; তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কন্যার জন্য একটী সৎপাত্র আহরণে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার নিমন্ত্রণে লক্ষ্নৌ বাসী স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষের পুত্র, বিলাত প্রত্যাগত তদানীন্তন সিটি কলেজের অন্যতম অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ ১৯০০সনের পূজার ছুটীর শেষভাগে বাঁকুড়ায় আগমন করেন। ইনি পূর্ব্বেই সরযূর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন, নিকটে আসিয়া তাঁহার গুণগ্রাম দর্শনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সপ্তাহ পরেই আবার তিনি বাঁকুড়ায় আসিলেন এবং সরযূর নিকট বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত

করিলেন। সরযূর মন তখন বিবাহের জন্য প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু স্নেহময় পিতার এবং বিবাহার্থী যুবকের নির্ব্বন্ধাতিশয়হেতু তাঁহাদের ইচ্ছায় মত প্রদান করিলেন। বিমলচন্দ্র নিজে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আবার চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন সরযূর অধ্যয়নাদি ও চিকিৎসা বিষয়ে প্রতিবন্ধক হওয়া দূরে থাকুক, সাধ্যমত সাহায্য করিবেন। ভালবাসার সহিত জ্ঞানার্জ্জনে স্বাধীনতা ও সেবাব্রতে সাহায্য লাভের আশা সামান্য আকর্ষণ নহে। এই প্রসঙ্গে সরলা, পবিত্র হৃদয়া সরযূর সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। বিমলচন্দ্র বিবাহের প্রস্তাব করিবা মাত্র তিনি তাঁহাকে দুইটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। 'আপনি জানেন, কি রোগে আমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে? আপনি জানেন আর এক ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল?' এই দুই বিষয় যুবক সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন, একথা জানিয়া তবে তাঁহার অপর কথা শুনিতে স্বীকৃত হইলেন। এখানে আরও একটী কথা উল্লেখ যোগ্য। বিমল চন্দ্রের দ্বিতীয়বার আগমনের দুই তিন দিন পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়ের গৃহে একটী অতি শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের কনিষ্ঠা কন্যাটী চিকিৎসকের অজ্ঞতায়, Deptheria রোগে এক সপ্তাহ ভুগিয়া প্রাণ হারায়। সরযূ বালা অনুজা প্রিয়বালার সহিত শেষ দিনে শিশুর সেই ভীষণ রোগের অবর্ণনীয় যন্ত্রণার সাক্ষী থাকিয়া, তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন। সন্তানের আকস্মিক ও ভয়ানক মৃত্যুতে জননীর হৃদয় শোকে পরিপূর্ণ, তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সরযূর কল্যাণাকাঙ্ক্ষিনী হইলেও এই সময়ে কোন আনন্দ কোলাহলে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে অস্বভাবিক ও অসম্ভব। সরযূর পিতা সরযূর ভবিষ্য সুখ চিন্তা করিয়া এই সময়ে কন্যার বিবাহ দেওয়া নিজের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন, কিন্তু সরয নিজে মাতার কথা ভাবিয়া

বিবাহের প্রস্তাবে কাণ দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। তিনি পিতাকে বলিয়াছিলেন, "মার তো এই অবস্থা, এখন এসব ব্যাপার কেন?" বর বিলাত গিয়া চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিবেন, এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ব্বিসে প্রবেশ করিতে হইলে বিমলচন্দ্রের আর কাল বিলম্ব না করিয়া, এক মাসের মধ্যেই বিলাত যাওয়া আবশ্যক, এই কারণে, যত শীঘ্র সম্ভব কেদারনাথ রায় বিবাহ দিয়া কন্যা ও জামাতাকে বিলাত পাঠাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি কন্যার বিবাহের এবং বিলাত বাসের যোগ্য বস্ত্রাদি তৈয়ারি ও অন্যান্য সকল আয়োজন করিবার জন্য কলিকাতা যাইবেন স্থির করিলেন। সরযূ তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, এখন মাকে ফেলিয়া তোমার কোথাও যাওয়া উচিত নহে, তুমি এখানে থাক, আমিই কলিকাতা গিয়া সব করাইতেছি।" পবিত্র হৃদয়া বালিকা নিঃসঙ্কোচে আপনার বিবাহের উদ্যোগ করিতে কলিকাতা গেলেন! প্রসঙ্গ ক্রমে আর একটী কথা বলিতে হইল। সরযূর ও তাঁহার বরের বিলাত যাইতে এবং তথায় থাকিতে অনেক অর্থব্যয় হইবে মনে করিয়া, সরযূ বিলাত যাইবার প্রস্তাবে প্রথমতঃ কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। তিনি মনে করিতেন ইহাতে তাঁহার বিমাতার ও শিশু ভাই ভগিনী গুলির প্রতি পিতার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাই ভগিনীর প্রতি এই সুবিচার ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। যখন তাঁহার বর বলিলেন যে এই অর্থ তিনি ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিতেছেন, কেবল তখনি সংশয়াকুল চিত্তে বিলাত যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

বিমাতার সহিত সরযূর ব্যবহার সবিস্তার লিখিবার অবসর নাই। তাঁহাদের মধ্যে যে এত সদ্ভাব ছিল, তাহা সরযূর গুণেই সম্ভব হইয়াছিল। পাছে মার মনে একটু আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় কি স্কুলে অবস্থান কালে, কি কলম্বো থাকিতে, কি বিলাত হইতে, কি রোগের অবস্থায়

দার্জ্জিলিং হইতে, তিনি পিতাকে যেমন নিয়মিত পত্র লিখিতেন, মাতাকে ও সেইরূপ লিখিতেন ; কোন বার অবসর অভাবে লিখিতে না পারিলে পিতার পত্রে বিশেষ করিয়া সে বিষয় উল্লেখ করিতেন। কখনও লিখিতেন, "এই চিঠি মাকে দেখাইবে।" কোমল প্রাণ না হইলে পরের ব্যথা এত কে ভাবে ? নিজের সম্বন্ধে কোন কথা ইচ্ছা পূর্ব্বক মাতার নিকট কখনও গোপন করেন নাই, পরের নিষেধ না থাকিলে বা পরের ক্ষতির সম্ভবনা না থাকিলে, সকল কথা খুলিয়া বলিতেন। তাঁহার মাতা তাঁহার এই সরলতায় তাঁহার নিকট বিক্রীত ছিলেন। অনেক বিষয় তাঁহাদের রুচিও ভাবের ঐক্য ছিল ; উভয়েই বাহ্যিক সৌজন্য হইতে আন্তরিক সদ্ভাব ও সরলতার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাদের মধ্যে কোন দিন মনোমালিন্য ঘটে নাই ; একে অপরকে বুঝিতে ক্ষণেকের ভুল হইলে পরক্ষণেই সে ভুলের অপনোদন হইত।

পিতার প্রতি সরযূর অসাধারণ ভক্তির কথা না বলিলে সরযূর কোনও কথাই ঠিক বলা হয় না। সরযূকে পিতা যেমন প্রাণাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন, সরযূ ও পিতার জন্য তেমনি অকাতরে প্রাণ দিতে পারিতেন। পিতাকে অসুখী দেখিলে সরযূর প্রাণে সুখ থাকিত না। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা সরযূর পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। তাঁহার সকল চিন্তা সকল চেষ্টার উপরে ছিল পিতাকে সুখী করিবার চেষ্টা।

বাঁকুড়া সহরে ১৯০০ সনের ২৩ শে ডিসেম্বর, মহা সমারোহে সরযূর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। সরযূর পিতার বন্ধুবান্ধবগণের অনেকেই সরযূর গুণগ্রাহী ছিলেন ; বহু লোকের স্নেহাশীর্ব্বাদ লইয়া তিনি নূতন পথের পথিক হইলেন। সরযূ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে আজন্ম বর্দ্ধিত, বিমলচন্দ্র নববিধানসমাজভুক্ত। সরযূ বিবাহের জন্য আপনার মত ও বিশ্বাস, ও পুরাতন শিক্ষক ও আত্মীয় গণকে অস্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শুভানুষ্ঠানে উভয় সমাজের লোকেই

নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা এবং অনুরোধ বশতঃই তাঁহার পিতা উভয় দিকেরই প্রচারক দিয়া বিবাহের পৌরোহিত্য কার্য্য করাইয়াছিলেন। ধর্ম্মাভিমান, অনুদারতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ক্ষণেকের জন্য বিবাহ সভার শান্তি ও সৌন্দর্য্য কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট করিয়াছিল বটে, কিন্তু কন্যার মনের বল কিছুতে নষ্ট করিতে পারে নাই।

বিলাত বাস

বিবাহের কয়েক দিন পরে ২৯শে তারিখ বর কন্যা বিলাত যাত্রা করিলেন। বিলাত গিয়া সরযূ যাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, কি ভারতবাসী কি ইংরাজ, সকলেরই শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। তিনি দেশে ফিরিলে পরও সিবিলিয়ান মিঃ ঘরপুরিয়া, পণ্ডিতবর মিঃ পরঞ্জপ্যে প্রভৃতি এবং কয়েকটি ইংরাজ মহিলা মাঝে মাঝে পত্র লিখিয়া তাঁহার সংবাদ লইতেন। পত্নীকে সর্ব্বত্র আদৃতা ও প্রশংসিতা দেখিয়া স্বামীর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সরযূর পিতাকে এতৎপ্রসঙ্গে লিখিলেন "I am proud of my wife"।

নবদম্পতি কেম্ব্রিজে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। চিকিৎসা ও শুশ্রূষা বিদ্যা শিক্ষা করিবার ইচ্ছায় সরযূ বিলাত গমন করেন, কিন্তু বিলাত যাত্রার কয়েক মাস পরেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এ কথাও, পিতা চিন্তিত হইবেন বলিয়া, পিতার নিকট কিছুকাল গোপন রাখেন। জুন মাসে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সমুদ্র তীরস্থ Torquay নামক স্থানে গিয়া কিছু দিন বাস করিয়া লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তথায় তাঁহার পিতার ইচ্ছানুসারে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সার রিচার্ড ডগলাস পাওয়েলের নিকট লইয়া যান। উক্ত প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সরযূকে পরীক্ষা করিয়া তৎকালে রোগের সঞ্চার অনুভব করিলেন না, কিন্তু বলিলেন যক্ষ্মা রোগ সঞ্চারের আশঙ্কা আছে বটে, ইহাঁকে খুবই সাবধানে থাকিতে

হইবে। কঠিন পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা বর্জ্জন, সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বাতাসে বাস ও সহজ জীর্য্য পুষ্টিকর আহার, চিত্ত প্রফুল্ল রাখিবার জন্য কোনও সহজ কাজ, ইত্যাদি ব্যবস্থা দিলেন, এবং শীত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বিলাত পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। সরযূর চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা চিকিৎসা বিদ্যা কিম্বা শুশ্রূষা কার্য্য শিক্ষা করেন। ডাক্তার তাঁহার আগ্রহাতিশয় জানিয়া ও ক্লাপহাম (Clapham) হাঁসপাতালের তত্বাবধায়িকা ডাক্তার মেকল সরযূর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে প্রতিশ্রুত আছেন শুনিয়া, তাঁহাকে ধাত্রী বিদ্যা ও শুশ্রূষা বিদ্যা শিখিতে অনুমতি দিলেন। তদনুসারে তিন মাস কাল হাঁসপাতালে থাকিয়া সরযূ উক্ত দুই বিষয়ে অনুশীলন করিয়া পরীক্ষা দিলেন, এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসা পত্র লাভ করিলেন। যে তিন মাস ক্লাপহামে শিক্ষা লাভে অতিবাহিত হইয়াছে, এ তিন মাস সরযূর বড়ই সুখে কাটিয়াছে। তিনি দেশে ফিরিয়া সে সময়ের অনেক কথা মাতাকে বলিতেন এবং বলিয়া সুখ বোধ করিতেন।

সরযূর দেশে ফিরিবার সময়ে তাঁহাকে একাকী আসিতে হইয়াছিল। বিলাতে জাহাজে না উঠিয়া, মার্সেল্‌স্ হইতে তাঁহাকে উঠিতে হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্বামীর আসিবার সুবিধা হয় নাই। একাকিনী, অল্প বয়স্কা সম্পূর্ণ বিদেশীয়া রমণীর পক্ষে পথে বিপদের সম্ভাবনা কম ছিল না। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে সকল বিপদ কাটাইয়া তিনি নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নবেম্বরের শেষ ভাগে তিনি বোম্বাই পৌঁছিয়া, প্রথমে শ্বাশুড়ীর নিকট লক্ষ্ণৌ গিয়া, পরে বাঁকুড়ার আসিলেন। তখন তাঁহার বাহ্য আকৃতিতে রোগের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু সেই সময়েই তাঁহাকে আহারাদি বিষয়ে একটু সাবধান বোধ হইত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে তাঁহার একটু অজীর্ণ দোষ উপস্থিত হইয়াছে। সুনিয়মে এবং সুপথ্যে এই দোষ শীঘ্র দুর হইবে সকলেই এইরূপ আশা করিতে লাগিলেন। মাঝে কিছু দিন একটু

ভাল বোধ হইল। ইংরাজী নববর্ষের আরম্ভে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের টন্‌সীল কাটাইবার জন্য তাহাকে লইয়া কিছু দিন কলিকাতা ডাক্তার নীলরতন সরকারের গৃহে আসিয়া রহিলেন। এই খানে থাকিতে একবার উদরাময় অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা সন্দেহের চক্ষে দেখেন নাই। জানুয়ারি মাসের মধ্যভাগে ভাইকে লইয়া বাঁকুড়া ফিরিলেন, তদবধি আহারাদি সম্বন্ধে আরও সতর্ক হইলেন। অতঃপর তিনি বিলাতে যাহা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিবার এক সুযোগ উপস্থিত হইল, তিনি আগ্রহের সহিত এই সুযোগের ব্যবহার করিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে তাঁহার একটী ভ্রাতার জন্ম হইল, তিনি তখন মাতার সেবা এবং ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। মাতা নানা কারণে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু শুশ্রূষা কার্য্যে তাঁহার আন্তরিক প্রীতি এবং যোগ্যতা দেখিয়া আর তাহাতে বাধা দিলেন না। যখন শারীরিক ক্লেশে মাতা নিতান্ত ক্লিষ্ট এবং অবসন্ন, তখন সরযূর স্নেহার্দ্র কণ্ঠের দুই একটী কথা শুনিলে তিনি সকল ক্লেশ ভুলিয়া যাইতেন। মাতার অনুপস্থিতিতে গৃহপরিদর্শনের ভারও তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। এ কার্য্যে সরযূবালা একটুও প্রীতি বোধ করিতেন না, বরং প্রায়ই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তিনি যেরূপ ইচ্ছা করিতেন, ভৃত্যদিগকে সেরূপ করিতে না দেখিলে তাঁহার একটু ক্রোধের সঞ্চার হইত। এই কোপন স্বভাবের পরিচয় পাইয়া তাঁহার মাতার সন্দেহ হইল যে তাঁহার শরীর নিশ্চয়ই অসুস্থ। এই সময় হইতে ডাক্তারকে অধিক সতর্কতার সহিত তাঁহার রোগ পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করা গেল। প্রথমে উদরাময়ের যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া যখন কোন উপকার হইল না, তখন ডাক্তারের সন্দেহ হইল যে ইহা যক্ষ্মা রোগের উপসর্গ। শরীর পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। তখন সরযূকে দার্জ্জিলিং পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা গেল।

যাইবার পূর্ব্বে ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁহাকে নিজ গৃহে রাখিয়া কিছুকাল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনিও ডাক্তার ওয়াট্‌সের সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন। সরযূ স্বভাবতঃই কৃশদেহা ছিলেন, তাহার উপর পেটের পীড়ায় শরীরে বলসঞ্চারপথ রুদ্ধ, অতএব ডাক্তারগণ সম্পূর্ণ আরোগ্যের আশা মনে স্থান দিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় কয়েক বৎসর বাঁচাইয়া রাখিবার একমাত্র উপায় বিশুদ্ধ পার্ব্বত্য বাতাসে স্থাপন, এই বলিয়া দার্জ্জিলিং রাখিতেই সকলে পরামর্শ দিলেন।

এপ্রেল মাসের মধ্যভাগে সরযূ কনিষ্ঠা প্রিয়বালার সহিত দার্জ্জিলিং গেলেন। প্রথম কয়েক মাস আশাতীত উন্নতি দেখিয়া আত্মীয়গণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কিন্তু বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে কাশি ও জ্বর বাড়িতে লাগিল। জুলাই মাসের শেষভাগে পীড়ার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ভগিনী প্রিয়বালা প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। রোগের যন্ত্রণা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আরোগ্যের আশা নাই জানিয়া, একে একে সহোদরগণ ও পিতা মাতাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার তত্ত্বাবধানের জন্য ছুটি লইয়া গিয়া দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন, পূজার ছুটিতে পিতা গিয়া তাঁহার কাছে রহিলেন. মাতা কয়েক দিনের জন্য জন্মের শোধ তাঁহাকে দেখিয়া আসিলেন। মৃত্যুর দেড় মাস পূর্ব্বে যখন লিখিবার শক্তি গত প্রায়, তখনও সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া মাতাকে শুশ্রূষা সম্বন্ধে নানা পরামর্শ দিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন; এই শিশুটির জন্যই মাতা শেষ এক মাস দার্জ্জিলিং যাইয়া তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতে পারেন নাই, শিশু দিগকে কলিকাতায় রাখিয়া কয়েক দিনের জন্য মাত্র গিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং চলিয়া আসিবার পরই সরযূ জ্যেষ্ঠ শিশু ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়া ছিলেন "ভোম্বল দাসকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করে"। গত সেপ্টেম্বর মাসেই একটী ভ্রাতার জন্ম দিনে

পিতাকে লিখিয়াছিলেন; "রাজুর জন্ম দিন ভুলি নাই।" ইহার জন্য কিছু খেলানা ও কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। শিশু ভাই বোন গুলিকে তিনি বড়ই স্নেহ করিতেন। তাহারাও তাঁহার বড় অনুগত ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ডাক্তার নীলরতন সরকার উভয় মহাত্মাই সরযূর ইচ্ছা শুনিয়া দার্জ্জিলিং গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন। সরযূ অনেককে ভাল বাসিতেন, অনেকে সরযূকে ভালবাসিয়া সুখী হইয়াছেন। তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য অতিমাত্র শোকার্ত্ত হইবেন, জানিতেন, এবং কেবল সেই জন্যই আরোগ্য লাভে যত্ন করিতেন। মৃত্যু যখন নিশ্চয় জানিলেন, তখন পিতাকে বলিলেন, "তুমি মিথ্যা আশা পোষণ করিও না। আমি জানি আমি আর সারিয়া উঠিব না; আমি মরিতে ভয় করি না; মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি; আমি চাই তুমিও আমার বিচ্ছেদ সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হও।"

সেই স্নেহমমতাময়ী মধুর প্রতিমা আমরা জন্মের শোধ বিদায় দিয়াছি। শেষ দুই মাস রোগের ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৪ঠা নবেম্বরের প্রত্যূষ কালে তাঁহার নির্ম্মল আত্মা অনন্তশান্তি লাভ করিয়াছে। তিনি ইহ-লোক হইতে পরলোকের অধিক যোগ্য ছিলেন, জগন্মাতা স্বর্গীয় কুসুম স্বর্গোদ্যানে লইয়া গেলেন।

সরযূ অল্প কালই সংসারে রহিলেন। তাঁহার সুন্দর চরিত্রের সকল দিক পূর্ণ বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি সংসার হইতে অবসৃত হই-লেন। এই সংক্ষিপ্ত জীবনে কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থতা, ন্যায়পরায়ণতা, পিতৃভক্তি, পরসেবাদি অনেক মহদ্‌গুণের বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সকল গুলির দৃষ্টান্ত হয়ত দিতে পারিলাম না। যিনি তাঁহার সহিত বহুদিবস বাস করিবার সুবিধা পাইয়াছেন তাঁহার মনে সরযূর চরিত্রের যে চিত্র থাকিবে তাহা ভাষায় অঙ্কিত করা সহজ নহে। তথাপি সরযূর বিশেষত্বের উল্লেখ আবশ্যক।

তাঁহার অধ্যয়নের ইচ্ছা প্রবল ছিল এবং অধ্যয়নীয় বিষয়ে রুচি উৎকৃষ্ট ছিল।

সেলাই কার্য্যে তাঁহার আশ্চর্য্য নিপুণতা ছিল। একবার দেখিলেই অতি কঠিন সেলাই সকল শিখিয়া যাইতে পারিতেন। ইচ্ছা পূর্ব্বক দর্জ্জির কাজ শিখিয়াছিলেন। যখন সকলের সঙ্গে গল্প করিতেছেন, তখন যাহাতে একটা কাজ হয়, সেই জন্য হাতে কিছু সেলাই রাখিতেন।

এই সঙ্গে তাঁহার এক প্রধান গুণ, সময়ের মূল্য জ্ঞান উল্লেখ করা যাইতেছে। সরযূ সময় নষ্ট করিতে কষ্ট বোধ করিতেন। অসুস্থতা হেতু নিদ্রা বা বিশ্রাম ভিন্ন অন্য সময় বিনা কাজে কাটাইতেন না।

পরিবারের মধ্যে তাঁহার সেবা পরায়ণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পরিবারের বাহিরেও সুবিধা পাইলেই কিছু করিতেন। বাঁকুড়ার কোন প্রাচীন য়ুরোপীয় মহিলা বাইসিকেল হইতে পড়িয়া এক খানি বাহু ভাঙ্গিয়া ফেলেন। সরযূ সংবাদ পাইবামাত্র পিতার গাড়ি লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং উক্ত মহিলাকে গাড়ীতে তুলিয়া তাঁহার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিলেন। যতক্ষণ ডাক্তারগণ তাঁহার হাড় জুড়িতে ছিলেন, ততক্ষণ কাছে থাকিয়া সকল কাজের সাহায্য করিলেন। সকালে এই ঘটনা ঘটে, সরযূ পীড়িতা রমণীকে আহারাদি দিয়া অনেকটা সুস্থ দেখিয়া, বেলা দুই ঘটিকার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসেন।

কলিকাতা আত্মীয়দিগের বাটীতে অবস্থান কালে যথাসাধ্য বাটীর মহিলাদিগের সাহায্য করিতেন। কেহ সেলাই শিখিতে আসিলে, বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, সময়ে অসময়ে তাহাকে শিখাইতে আরম্ভ করিতেন।

সরযূর ঈশ্বর ভক্তিও গভীর ছিল। বাহিরে কোন আড়ম্বর ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার নীরবতায় ও সঙ্গীতে এই ভক্তিভাব উচ্ছ্বসিত দেখা

যাইত। নিয়মিত দৈনিক উপাসনায় যোগদান করিতেন, প্রতি সপ্তাহে সমাজে উপস্থিত থাকিতেন, এবং সমাজকে ভাল বাসিতেন। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলা, মতের অনুদারতা অথবা গর্হিত মত প্রচলিত দেখিলে, মনে মনে ব্যথা অনুভব করিতেন।

রঙ্গপুর,
৪ঠা ডিসেম্বর ১৯০২

স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়।

স্বর্গীয় কেদারনাথ রায়

কেদারনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবীনাথের শৈশবেই মৃত্যু হয়। শোক বিহ্বলা মাতা কাশীধামে গিয়া, ভাবী সন্তান যাহাতে দীর্ঘজীবী হন সেইজন্য কেদারনাথ দেবতার নিকট মানস করেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার নাম সেই জন্যই কেদারনাথ রাখিয়াছিলেন।

কেদারনাথ রায় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে ডিসেম্বর, ঢাকা জেলার অন্তর্গত রঘুনাথপুরে, মাতুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মহেশদাস রায়গুপ্ত ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামের বিখ্যাত রায় বংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি রামপুর বোয়ালিয়ার জজ আদালতে মহাপেজের কাজ (Record Keeper) করিতেন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। জমীদারী সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁহার বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়াও তিনি নিজেই তাঁহার পৈত্রিক জমীদারীর তত্ত্বাবধান করিতেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁহার পরিবারের ও পুত্রের কোন বিষয়ে কষ্ট ছিল না।

সুয়াপুর গ্রামে রায়দের বাটীতেই বালকদের শিক্ষার জন্য একটি সামান্য বিদ্যালয় ছিল। কেদারনাথ এই খানেই তাঁহার প্রথম জীবনের শিক্ষালাভ করেন। স্কুলের শিক্ষকটি ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। পড়াশুনায় কেদারনাথের অত্যন্ত অধ্যবসায় ছিল, এবং হিন্দুধর্ম্মেও এই সময় তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি গল্প করিয়াছেন যে, অঙ্কে এই সময়ে তিনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন না; সেইজন্য অঙ্কের সময় আসিলেই দুর্গানাম জপ করিতে আরম্ভ করিতেন এবং শ্লেট ভরিয়া কেবল দুর্গানামই লিখিতেন।

গ্রামের স্কুল পরিত্যাগ করিয়া, তিনি কিছু দিন ঢাকায় পোগোস স্কুলে ও কিছু দিন তত্রত্য কলেজিয়েট স্কুলে যথাক্রমে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই সময় তাঁহার আত্মীয় বরদাকিঙ্কর রায় উকীল মহাশয়ের বাসায় তিনি থাকিতেন। সেখানে অন্যান্য দশ বারটি ছাত্রের সহিত এক প্রকোষ্ঠে থাকিয়া, যৎসামান্য আহার্য্য খাইয়া দিনপাত করিতেন। তাঁহার পিতার নিকট হইতে পুস্তকাদি ক্রয়, স্কুলের বেতন ও অন্য সমুদয় খরচের জন্য ১০৲ টাকা পাইতেন। ইহার পর কিছু দিন এক ছাত্রাবাসে ও ছিলেন। সেখানে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইবার পর তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহাকে নিজ কর্ম্মস্থান রামপুর বোয়ালিয়াতে লইয়া যান।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মত্ত নিবাসী ৺ দুর্গাপ্রসাদ সেনের কন্যা সৌদামিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৬৯খ্রীষ্টাব্দে কেদারনাথ রামপুরবোয়ালিয়া হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১০৲টাকা বৃত্তি পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে তৎকালে কেহই ষোল বৎসরের পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিত না। কেদারনাথ বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন বলিয়া, শিক্ষকেরা দুই বৎসর বয়স বাড়াইয়া, চৌদ্দ বৎসরেই তাঁহাকে দিয়া পরীক্ষা দেওয়ান। ১৮৬৪ সনের আশ্বিন মাসে, পূজার ছুটী উপলক্ষে মহেশদাস রায় সপরিবারে পদ্মা নদী দিয়া নৌকাযোগে বাড়ী যাইতেছিলেন। বিখ্যাত ঝড়ের রাত্রে তাঁহার নৌকা জলমগ্ন হইল, তিনি পত্নী ও পুত্রসহ রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে অর্থ ও জিনিষপত্র যাহা কিছু ছিল সমস্তই নষ্ট হইল। এই সঙ্গে কেদারনাথের জন্মপত্রকাখানিও যায়। কোষ্ঠিখানি সম্মুখে না থাকাতে, দুই বৎসর বয়স বাড়াইতে কেদারনাথের পিতা ভিন্ন আর কাহারও কোন আপত্তি হইল না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি এফ,এ, পাঠের জন্য কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রেরিত হন। শৈশবকাল হইতে ১৮৬৭ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে

বিশেষ আস্থা ছিল। ১৮৬৮ সাল হইতে হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। ঢাকায় অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মযুবকের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা হয়। ইহাঁরা উৎসাহী ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাঁহাদের সহিত ব্রাহ্ম-সমাজে যাইয়া তাঁহারও ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে মন আকৃষ্ট হয়। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ তখন অসামান্য প্রভাবে কাজ করিতেছিল। ঢাকা কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই ব্রাহ্মসমাজে ও বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গত সভায় যোগদান করিতেন। কেদারনাথও শীঘ্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যতা অনুভব করিয়া ১৮৭১ সালে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

কেদারনাথের পরিবার হিন্দু সমাজে পদমর্য্যাদায় অগ্রগণ্য ছিলেন; তাঁহার কনিষ্ঠ পিতৃব্য শ্রীনাথ রায় তখন ঢাকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহারা সকলেই তাঁহার এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুন্ন হইলেন। "ঢাকা প্রকাশ" ও "হিন্দুহিতৈষিণী" সংবাদ পত্র দ্বয়ে ব্রাহ্মদিগের তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল। তাঁহার পিতা মর্ম্মাহত হইয়া কাশীধামে যাত্রা করিতে স্থিরসংকল্প হইলেন। সঙ্গে কেদারনাথকে লইয়া গিয়া বেনারস কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, পুত্রকে কাশী-ধামে নিজের কাছে রাখিতে পারিলে, তাহার মতিগতি ফিরাইতে পারি-বেন। কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপালই এই বিষয়ে প্রধান অন্তরায় হইলেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত ভাল ছাত্র ছিলেন বলিয়া, তিনি কেদারনাথকে কলেজ ছাড়িতে দিলেন না।

কেদারনাথের মাতা এই সময়ে বধূ, একটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া সুয়াপুর গ্রামে বাস করিতেছিলেন। মাতার ইতিপূর্ব্বেই মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল, তিনি গৃহকর্ম্ম কিছুই তত্ত্বাবধান করিতেন না, বালিকা সৌদামিনীই এই সময়ে প্রকৃত পক্ষে গৃহকর্ত্রী ছিলেন। স্বামীর নিকট হইতে চিঠী পাওয়া ও চিঠী লেখার জন্য তাঁহাকে গ্রামে অনেক লাঞ্ছনা

ও তিরস্কার সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ সকল অত্যাচার তিনি অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন।

১৮৭১ সালের একটি ঘটনা এইস্থলে উল্লেযোগ্য। এই সময়ে ব্রাহ্ম-যুবকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন জাতিভেদের মূলে সবলে কুঠারাঘাত করিবার উদ্দেশ্যে, একদিন প্রকাশ্য-ভাবে কতিপয় মুসলমানের সহিত একত্রে আহারাদি কারলেন। হিন্দু সমাজের নেতৃগণ এই ঘটনাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ইহাঁদের ও যাঁহারা অতঃপর ইহাঁদের সহিত একত্রে আহার করিলেন, সকলকে সমাজচ্যুত করিলেন। কেদারনাথের কলিকাতাস্থ আত্মীয়, যাঁহার গৃহে তিনি এই সময় অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাকে উহাঁর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বলিলেন। তিনি তখন অনন্যোপায় হইয়া শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেনদের ৩৩নং মুসলমানপাড়ার ছাত্রাবাসে আশ্রয় লইলেন।

তাঁহার পিতা সংবাদ পাইয়াই কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে প্রায়-শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু হইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু বিফলচেষ্ট হইয়া ভগ্নহৃদয়ে কাশীতে ফিরিয়া গিয়া, অনতিকাল পরেই ইহলোক পরি-ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে কেদারনাথ এফ এ দিয়া ছুটীতে দেশে যাইতেছিলেন, তাঁহার পিতৃব্য শ্রীনাথ রায় ও সবজজ পদ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় যাইতে-ছিলেন। গোয়ালন্দে উভয়ের সহিত উভয়ের দেখা হইল, এবং পিতৃব্য তাঁহাকে পিতৃশ্রাদ্ধ করাইবার জন্য সঙ্গে করিয়া সুয়াপুরে আসিলেন। পিতৃ শোকার্ত্ত কেদারনাথ কোন কথা কহিলেন না, রীতিমত হবিষ্যাদি করিতে লাগিলেন।

শ্রীনাথ রায় বাড়ী আসিয়াই কেদারনাথের প্রায়শ্চিত্তের সব বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল কেদারনাথকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, তাঁহার দ্বারাই হিন্দুমতে পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

করাইবেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা প্রায়শ্চিত্তের সমুদয় আয়োজন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, কেদারনাথের দেখা নাই। অনেক ডাকাডাকির পর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সকলে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট আসনে ধরিয়া বসাইতে গেলেন, তিনি সবলে আসন ও পূজার উপকরণাদি উল্টাইয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে তাঁহার পিতৃব্য মহাশয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, কারণ তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে আনাইতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব রাত্রি ভোর না হইতে হইতেই স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বাটী হইতে পলায়ন করিলেন। সঙ্গে কয়েক আনা পয়সা ও একখানি ছুরী সম্বল। ছুরী লইবার অর্থ এই যে, কেহ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে ছুরী দ্বারা নিজকে আহত করিবেন, তাহা হইলেই তাহারা ছাড়িয়া দিবে। কতকদূর নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক নৌকার মাঝিকে বলিলেন, আমাকে ঢাকা লইয়া চল। মাঝি তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছে, সে বলিল "আপনাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিয়াছে, বাড়ী ফিরিয়া যাউন।" কিন্তু কেদারনাথকে নিতান্তই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া সে তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয় বরদাকিঙ্কর রায় মহাশয়ের বাটীতে পৌছাইয়া দিবে বলিল। নৌকা ঘাটে আসিবামাত্রই কেদারনাথ আত্মীয়ের বাটীতে প্রবেশ না করিয়া, সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কেহই তাঁহার সন্ধান পাইল না, সুতরাং তাঁহার দ্বারা আর হিন্দুমতে পিতৃশ্রাদ্ধ করান গেল না।

এইবারে এফ,এ, পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু বৃত্তি পাইলেন না। তাঁহার পিতৃব্য তাঁহার খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের জমিদারীর আয় নিতান্ত কম না হইলেও অধিকাংশ দেবসেবা ও অন্যান্য

খরচ বাবত কাটিয়া লওয়া হইত। মাত্র ৮৲ টাকা তাঁহার স্ত্রী সংসারের খরচের জন্য পাইতেন। এই দারিদ্র্যের সময় প্রচারক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শানুসারে কেদারনাথ Calthedal Mission Collegeএ বি, এ, পাঠের জন্য ভর্ত্তি হইলেন। শ্রদ্ধেয় কান্তি বাবু ভিক্ষা করিয়া কোন প্রকারে তাঁহার খরচ চালাইতে লাগিলেন। কেদারনাথ ছেলে পড়াইয়া কিছু উপার্জ্জন করিতেন, ইহা কান্তি বাবুর হাতে দিতেন। তিনি চারি মাস এই ভাবেই কাটিয়া গেল। অতঃপর তাঁহার মাতামহী দেবী ঘটনাক্রমে এই সকল সংবাদ জানিতে পারিয়া, নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং পুত্র গুরুদাস দাস-গুপ্তকে বলিলেন, "কেদার অনাহারে কষ্ট পাইতেছে, আমি মুখে অন্ন তুলিব না।" যতক্ষণ না টাকা পঠান হইল, বৃদ্ধা সত্য সত্যই অনাহারে রহিলেন। মাতার অনুরোধে গুরুদাস বাবু ভাগিনেয়ের খরচের জন্য মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। কেদারনাথের পিতৃব্য এ সংবাদে বিরক্ত হইলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন, আর্থিক কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া, কেদারনাথ পুনরায় হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিবেন।

হিন্দুমতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে অসম্মত হওয়ার পর হইতে আত্মীয়স্বজন কেদারনাথকে সমাজচ্যুত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের অত্যাচার শুদ্ধ কেদারনাথের উপরই পর্য্যবসিত হয় নাই, তাঁহার স্ত্রী সৌদামিনীকেও এজন্য উৎপীড়িত হইতে হইয়াছে। কতকটা সৌদামিনীকে এই উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং কতকটা মিঃ ক্রফ্‌ট ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালরূপে বদলী হইয়া আসাতে, ১৮৭৩ সনে কেদারনাথ কলিকাতা ছাড়িয়া ঢাকায় চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হইলেন। ঢাকা আসিয়া তিনি উন্মাদগ্রস্তা জননী ও বালিকা পত্নী লইয়া সংসার পাতিলেন। আয় ছিল মাতুলদত্ত মাসিক ২০৲ টাকা ও জমিদারী

হইতে ৮৲ টাকা। ইহা হইতে বাড়ী ভাড়া ১০৲ টাকা, চাকরাণীর বেতন ৩৲ টাকা, কলেজের ফি ৫৲ টাকা দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তদ্দ্বারা তিনটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে হইত। কিন্তু বিবেককে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বাধীন ভাবে চলিতে পারিতেছিলেন, ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া পরস্পরের জন্য পরস্পর খাটিতেছিলেন, উভয়ের প্রতি উভয়ের গভীর প্রেম ছিল, সুতরাং এই তরুণ দম্পতি দারিদ্র্যের মধ্যেও পরম সুখী ছিলেন। জীবনের শেষ দিনে কেদারনাথ ঐ সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিতেছিলেন, "This was the best and happiest period of our life. এই অবস্থায় একদিন তরকারীর অভাবে উঠান হইতে কচি কচি ঘাস তুলিয়া শাকের ন্যায় রন্ধন করিয়া ইঁহারা পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলেন। লিখিয়া গিয়াছেন, "I commend these trials and struggles to my children and grand children. Probably none of them will have to pass through my experiences. but if any one comes to distress during the period of his education. he may remember my struggles and take courage to fight out his battles."

তিনি নিজে বি, এ, পরীক্ষার জন্য পড়িতে লাগিলেন, পত্নীকে ঢাকার স্ত্রী-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন এবং পত্নীর যাহাতে সুশিক্ষা লাভ হয় তৎপক্ষে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে লাগিলেন। ১৮৭৪ অব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজিয়েট স্কুলে ৩০৲ টাকা বেতনে 1st Asst. Teacher পদে নিযুক্ত হইলেন। ঐ বৎসর তাঁহার প্রথম পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথের এবং ইহার পর বৎসর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র যতীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ১৮৭৬ সনে এম, এ, ও ১৮৭৭ সনে বি, এল, পরীক্ষা দিলেন। এই তিন বৎসর পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খরচও বাড়িয়াছিল, কিছু ঋণও হইয়াছিল। অথচ সে অবস্থায়ও অন্য দুঃস্থ পরিবারকে

সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। ঢাকায় যে বাটীতে ছিলেন, সে বাটীতে সোহাগদল পরিবারকে প্রশস্ত ঘর খানি দিয়া, আপনারা এক খানি ছোট ঘরে বাস করিতেন। সে সময়ে সে পরিবারের অন্যত্র থাকিবার স্থান ছিল না। তাঁহার বাটীতে থাকিতে থাকিতেই এই পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেনের (Mr. A. C. Sen) সহিত বিবাহ স্থির হয়। ইঁহারা অন্যত্র উঠিয়া গেলে, যথাক্রমে আর দুইটি ব্রাহ্ম পরিবারকে এই দরিদ্র দম্পতি নিজ বাটীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। পরের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে কেদারনাথ কোন দিন পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

নারীজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার আচার ও ব্যবহারে তাঁহাদের প্রতি কিরূপ সম্ভ্রম ও সৌজন্য প্রকাশ পাইত, তাহা তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে যাহাতে দুর্নীতি প্রবেশ করিতে না পারে, ঢাকা বাসকালে সে বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। পতিতা নারীরা যাহাতে সংশোধিত জীবন যাপন করিতে পারেন তৎপক্ষে অনেক সহায়তা করিতেন।

বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি রঙ্গপুরে গিয়া ওকালতী আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মাতুল গুরুদাস বাবু সেখানে একজন মোক্তার ছিলেন, তাঁহার বাড়ীতেই গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার আয় ১০০৲ টাকার অধিক ছিল না। উহা কখন নিজে রাখিতেন, কখন বা মাতুলের হাতে দিতেন। ঢাকায় অবস্থান কালে গৃহে যে পারিবারিক উপাসনা আরম্ভ হইয়াছিল, মাতুলালয়ে তাহা নিয়মিতরূপে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেখানে বাধ্য হইয়া হিন্দু আচার ও জাতিভেদ মানিয়া চলিতে হইত। এই অবস্থায় সৌদামিনী কিছু ভীত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সম্পর্কীয় বাবু বিহারীলাল সেনকে পত্র লিখিলেন। ইনি সৌদামিনীর যেমন আত্মীয় ছিলেন, সেইরূপ তাঁহার

স্বামীরও ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন। ইহাঁর আগমনে উভয়ে বিশেষ উপকৃত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই, মিঃ বেভারিজের বিশেষ সহায়তায়, কেদারনাথ অস্থায়ীরূপে মুন্সেফী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং ১৮৭৯ সনের অক্টোবর মাসে স্থায়ী মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হইলেন। স্থায়ী হইয়া কিছুদিন নেলফা-মারী থাকিয়া, বাঁকীপুর বদলী হইলেন। এইখানে তাঁহার ধর্ম্মজীবন বিকাশের অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়ের সহিত এইখানেই তাঁহার সৌহার্দ্দ্য জন্মে। এই সময় হইতে জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত ঈশ্বর নিষ্ঠা, উপাসনা, পরিবারের, সমাজের ও দেশের সেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণে দিন দিন অধিকতররূপে বর্দ্ধিত হইতেছিল। তিনি যখন বাঁকীপুর ছিলেন, তখন আচার্য্য কেশবচন্দ্র কয়েক-জন প্রচারকসহ তথায় গমন করেন এবং তাঁহার গৃহে থাকিয়া বাঁকীপুরে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করেন। কেদারনাথ বহুদিন ধরিয়া, বহুযত্নে অতিথি-গণের সেবা করেন। উত্তরকালে ইনি সাধারণ সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রচারক বন্ধুদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতেন।

বাঁকীপুর হইতে তিনি হাবড়া বদলি হন। তিনি কলিকাতায় বাস করিতেন এবং হাবড়ায় গিয়া আফিস করিতেন। Bengal Tenancy Act লিখিয়া তিনি হঠাৎ তাঁহার উপস্থিত জজ সাহেবের বিদ্বেষভাজন হইলেন। ইহার ফলে তাঁহাকে পাবনা বদলী হইতে হয়।

যতদূর জানা গিয়াছে, চাকুরী গ্রহণ করিয়া অবধি এবং ১৮৮৭ সনে পাবনা বদলী হওয়া পর্য্যন্ত, গৃহে বা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার কোন অসুখ বা অশান্তি ছিল না। যে আয় ছিল সেই আয়ের মধ্যে পাঁচ ছয়টি পুত্রকন্যা লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন ও নানাবিষয়ে নানাপ্রকার বন্ধুবান্ধব-দিগের সাহায্য করিতেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ক্রফট সাহেব ইহাঁকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, সুতরাং তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই দেখা সাক্ষাৎ

করিতে যাইতেন; এই সুযোগে শিক্ষাবিভাগে তাঁহার যে সকল বন্ধু-বান্ধব ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি অবিচারাদি হইলে তাঁহারা তাহা জানাইতে পারিতেন। কাহারও চাকুরী করিয়া দেওয়া, কাহারও চাকুরীর দরখাস্ত লিখিয়া দেওয়া, অবিচার বা অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থ আবেদনাদি প্রেরণ করা, বন্ধুদের মধ্যে মনোবাদ ঘটিলে তাহা মিটাইয়া শান্তি সংস্থাপন করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। তাঁহার মিষ্ট ভাষা ও শিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

১৮৮৮ সনে তিনি Statutory Civil Service পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। জজ র‍্যাম্পিনীর সহিত মনোবাদের পর তিনি বুঝিয়াছিলেন যে মুন্সেফ থাকিলে তাঁহাকে আরও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে। কতকটা এই ভয়ে এবং কতকটা আপনার দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ বশতঃ এই পরীক্ষা দিয়া অবস্থার উন্নতি সাধনে অগ্রসর হন। এ বিষয়ে তিনি Sir Alfred Croft হইতে যথেষ্ট সহানুভূতি ও আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন।

Statutory Civilian হইবার পর তিনি পদ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ইংরাজী পোষাক পরিধান ও ইংরাজী ধরণে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে ক্রমে ব্যয় বাড়িতে লাগিল। এই সময়েই তাঁহার পিতৃব্য, কলিকাতা Small Cause Courtএর জজ, শ্রীনাথ রায় অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে কিছুকাল কাশীবাসিনী পিতামহীদেবীর খরচ এবং পিতৃব্য পরিবার সংস্থষ্ট আরও কোন কোন খরচ তাঁহাকে বহন করিতে হইয়াছিল। Statutory Civilian হইয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ Asst. Magistrate রূপে কৃষ্ণনগর যাইতে হয়। এই স্থানে তাঁহার চতুর্থ পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁহার পত্নী সৌদামিনী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন; ক্রমে এই রোগ হইতে দুশ্চিকিৎস্য যক্ষ্মা রোগ জন্মে। কৃষ্ণনগর হইতে শিয়ালদহে ও পরে আলিপুরে Joint

Magistrate নিযুক্ত হন। দিবসে কাছারীর কাজ করিয়া বিকালে ও রাত্রে রুগ্না পত্নীর সেবা করিতেন, নিদ্রা ও বিশ্রাম অতি অল্পই হইত। দেড় বৎসরের সেবা, যত্ন ও বহু ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার পর ১৮৯১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি তাঁহার আবাল্য সহচরী ও সহধর্ম্মিণী সৌদামিনী দেবীকে হারাইলেন। এত দিনের কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভগ্ন হইল।

পত্নী বিয়োগের পর সন্তানদিগের শিক্ষাদানই তিনি জীবনের প্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেন। পত্নীর চিকিৎসার জন্য তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়া ছিলেন, তাঁহার তৎকালে যে বেতন ছিল তাহা দ্বারা উভয় পুত্রকে বিলাতে শিক্ষাদান তাঁহার মত লোকের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইলেও তিনি একসঙ্গে দুই পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া দিলেন। এই দুষ্কর কার্য্য করিতে গিয়া তিনি নিজের মস্তকে কি পরিমাণ ঋণ, চিন্তা, পরিশ্রম ও দারিদ্র্যের ভার তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। প্রথমতঃ তাঁহার কন্যাত্রয় বেথুন কলেজে দিয়া, অপর শিশুদ্বয়কে তাহাদের মাতুলের নিকট রাখিয়া, নিজের কর্ম্মস্থানে একাকী গেলেন। ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কিরূপ খাটিতেন, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়,। মাঝে মাঝে চলৎশক্তিহীন হইতেন, ভৃত্যেরা তাঁহাকে বহন করিয়া এজলাসে বসাইয়া দিত, কখন বাতে হাত অবশ হইয়া যাইত, অপরকে দিয়া রায় লিখাইয়া কষ্টে সহি করিতেন। অর্থাভাবে ছুটী লইতে সাহস হইত না। কিন্তু এমন এক সময় আসিল যখন একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন, তখন ছুটী না লইয়া পারিলেন না। এই রোগ ভোগের পর পারিবারিক সুখ, প্রীতি ও সহানুভূতির জন্য তাঁহার আবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। ১৮৯৪ সনের আগষ্ট মাসে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু পরিবার মধ্যে রোগের আতিশয্য এবং ঘন ঘন মৃত্যুর তাড়নায় সাংসারিক সুখ তাঁহার ভাগ্যে অল্পই ঘটিয়াছে। রোগ শোক ও দারিদ্র্যের সহিত

তিনি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, কিরূপ সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এস্থানে অসম্ভব। এই সকল বিপদের মধ্যে তিনি কিরূপ নিস্বার্থ ও গভীর প্রেম, অতুলনীয় সন্তান-বাৎসল্য, আশ্চর্য্য সেবাপরায়ণতা ও কঠিন কর্ত্তব্য নিষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরিবারস্থ ও পরিবার সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিরাই জানেন।

যে কেহ তাঁহার সহিত অধিক দিন বাস না করিয়াছে এবং তাঁহাকে ভাল করিয়া না বুঝিয়াছে, তাহার নিকট তাঁহার সন্তান বাৎসল্য ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠা অনেক সময়ে উন্মত্ততা বলিয়া বোধ হইয়াছে। তাঁহার প্রথম পক্ষের তিনটি সন্তান একে একে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে একাদশবর্ষীয়া প্রিয়তমা কন্যা চারুবালা অল্প দিনের জ্বরে প্রাণ হারায়। ইহার জন্য তিনি যেরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন, পুরুষেতো কথাই নাই, স্ত্রীলোকের মধ্যে ও এরূপ শোক বিহ্বলতা সচরাচর দেখা যায় না। এই ঘটনার বৎসরাধিক কাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্র যোগেন্দ্রনাথ ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছিল। তাহাকে নানাস্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পাঠাইয়া বিফল চেষ্ট হইয়া, অবশেষে জ্যেষ্ঠা কন্যা সরযুবালা ও বাবু বিহারীলাল সেনের সহিত তাহাকে সাত মাস কলম্বোতে রাখিয়াছিলেন। সেখানে প্রথম হস্পাতালে, পরে সমুদ্রতীরে বাড়ী করিয়া রাখিতে বহুল অর্থব্যয় হইত, সুতরাং ঋণের উপর ঋণ স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। আড়াই বৎসরের সংগ্রামের পর মৃত্যুর জয় হইল, তিনি চতুর্দ্দশবর্ষীয় পুত্র হারাইলেন। ইহার পরও কঠিন রোগ ও মৃত্যু তাঁহার গৃহ অনেকবার অন্ধকার করিয়াছে। ১৯০০ ডিসেম্বর মাসে তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা সরযূবালাকে বিবাহ দিয়া ডাক্তারি শিখিবার জন্য জামাতার সহিত তাঁহাকে বিলাত প্রেরণ পূর্ব্বক উভয়ের সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। এই সুশীলা কন্যা তথা হইতে পীড়িত হইয়া দেশে ফিরিলেন এবং সকল চেষ্টা ও চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া ১৯০২ সনের নবেম্বর মাসে স্বর্গারোহণ করিলেন। কন্যাদিগের

শিক্ষার জন্য তিনি অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন এবং সমারোহের সহিত তাহাদের বিবাহ দিয়াছেন, রোগের সময় যে কত ব্যয় করিয়াছেন তাহার তো কথাই নাই। তাঁহার কোন কোন বন্ধু বলিতেন যে, ইহাঁর বিশ্বাস টাকা আর ঔষধের বলেই জগৎ হইতে মৃত্যুকে দূর করিয়া দেওয়া যায়।

রোগীর সেবা ও বিপন্নের কার্য্যোদ্ধার করিবার সময় কেদারনাথের সময়ের জ্ঞান থাকিত না, দিন রাত্রির প্রভেদ থাকিত না, ক্ষুধা নিদ্রা বোধ দূর হইত। কিন্তু অন্য সময় নিয়মপরায়ণতা, যথাকাল কর্ম্মিতা, ও শৃঙ্খলা বিষয়ে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। পরিবারস্থ কেহ সময় মত কাজ করিতেছে না দেখিলে, তিনি অসহ্য কষ্ট বোধ করিতেন, এবং ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। সন্তানদিগকে সময় মত স্নানাহার করাইবার জন্য তিনি ঘণ্টার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; পাঠের ঘণ্টা, স্নানের ঘণ্টা, আহারের ঘণ্টা, দিনে অনেক বার বাড়ীতে ঘণ্টা বাজিত। সরকারী কার্য্য হইতে অবসৃত হইবার পর সন্তানদিগের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকে কিছুদিন মন দিতে পারিয়াছিলেন। নিজে তিনি প্রত্যূষে উঠিতেন এবং যে সময়ে যে কাজ, সেই সময়ে সেই কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। ৬ টায়, ১০ টায় ও বিকালে ৪ টার সময় তাঁহার পূর্ব্বে কেহ টেবিলে আসিতে পারে নাই।

বৃহস্পতিবার বিলাতে চিঠী যাইবার দিন। তিনি রবিবার বিলাতের চিঠী পাইয়াই সেই দিন, অথবা সোম মঙ্গলবারের মধ্যে বিলাতের চিঠী লিখিয়া রাখিতেন, ভয়, পাছে Mailday তে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক আসে এবং সময় মত চিঠী না যায়। প্রায় সব business letters নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে type করিয়া রাখিতেন।

চিঠী পত্র, দরকারী কাগজ সকল সময়ে গুছাইয়া ফাইল করিয়া রাখিতেন। তাঁহার মত হিসাব রাখিতে কেহ পারিত না, অথচ তাহার মত ব্যয়শীল লোকও সচরাচর দেখা যায় না।

তিনি আইনে সুপণ্ডিত ছিলেন, সকলেই স্বীকার করেন। সরকারী কাজ তিনি চিরদিন দক্ষতার সহিত করিয়া আসিয়াছেন। বিচারাসনে বসিয়া তিনি এক ধর্ম্মরাজ বিধাতা ব্যতীত কাহাকেও ভয় করিতেন না। তিনি একদিকে যেমন স্বাধীনচেতা ছিলেন, অপরদিকে তেমনি দয়ালু ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন, কোন্ পক্ষে ন্যায় ও ধর্ম্ম বুঝিবার জন্য চিন্তা, অধ্যয়ন ও পরিশ্রমে কোন দিন বিমুখ ছিলেন না। দায়রার মোকদ্দমা উপলক্ষে তিনি কাছারিতে বাতি জ্বালিয়া ৮টা ৯টা পর্য্যন্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন, বাড়ীতে জাগরণ করিয়া রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত বসিয়া রায় লিখিয়াছেন। তাঁহাকে কার্য্যদক্ষ জানিয়াই যেখানে বেশী কাজ গবর্ণমেণ্ট সেখানে তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। জজরূপে তিনি প্রায় সর্ব্বদাই ডবল ডিষ্ট্রীক্ট পাইয়াছেন, যেমন পাবনা-বগুড়া, রঙ্গপুর-জলপাইগুড়ি, যশোহর-খুলনা বীরভুম-দুমকা। যখন যেখানে গিয়াছেন, অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে একদিকে শাসন করিয়াছেন, কাজ শিখাইয়াছেন, দুর্নীতি দেখিলে তিরস্কার করিয়াছেন বা শাস্তিও দিয়াছেন, অপর দিকে যোগ্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদা পদোন্নতি দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, অযোগ্যের প্রতিও অবিচার হইলে তাহার প্রতিবিধান করিয়াছেন, এবং সকলের বেদনায় ব্যথিত হইয়াছেন। তিনি খাটিতে ও জানিতেন, খাটাইতে ও জানিতেন। কোন কোন স্থানে দেখা গিয়াছে, দুর্নীতিপরায়ণ অথবা অযোগ্য কর্ম্মচারী উহাঁর আগমনমাত্রেই কার্য্য হইতে ছুটী লইয়াছে। এইরূপ দুই চারিটি লোক ভিন্ন বদলী হইবার সময় সকলেই উহাঁর জন্য হায় হায় করিয়াছে। যখন যে জেলায় থাকিয়াছেন, উকীল মুন্সেফ, ডেপুটী, সব জজ প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সৌজন্যে মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার ভদ্রতা কেবল পদস্থ ব্যক্তির জন্যই ছিল না, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে তিনি সকলের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন।

তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহাকে অনেক সময় লোকের ও গবর্ণমেণ্টের

অপ্রিয় করিয়াছে। জজরূপে তিনি আপনাকে জেলার নাবালক জমিদারগণের অভিভাবক বলিয়া জানিতেন। এই সকল নাবালকের সম্পত্তি ও অর্থের সর্ব্বদাই অপব্যবহার ঘটে। কেবল আত্মীয় স্বজন ও জমীদারী গোমস্তারাই ইহাদের অর্থ শোষণ করে তাহা নহে, সরকারী কর্ম্মচারী ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের অনবধানতা হেতু এবং কখন কখন তাহাদের জ্ঞাতসারে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্যও ইহাদিগের অনেক অর্থের অযথা ব্যয় হয়। এই সকল নিবারণ করিতে গিয়া, তিনি যে কেবল ঐ প্রকৃতির লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া ছিলেন তাহাই নহে, গবর্ণমেণ্টের নিকট ও যথেষ্ট তিরস্কার ও লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরের হিত করিতে গিয়া তিনি নিজে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যাহাদিগের মঙ্গলের জন্য তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহারাও তাঁহার প্রতিকূলতা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কোন নাবালক জমীদারের সুশিক্ষার জন্য পিতার ন্যায় চিন্তা, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই।

স্বাধীনচিত্ততার জন্য তিনি উপরিস্থ রাজপুরুষদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। জন্মপত্রিকা হারাইয়া যাওয়াতে তাঁহার বয়স দুই বৎসর বাড়াইয়া, শিক্ষকেরা তাঁহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য উপস্থিত করেন। চাকুরী লইবার দুই বৎসর পরে, তিনি মাতুলের অনুরোধক্রমে, ঐ ভুল সংশোধিত করেন। মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়, মাতুল গুরুদাস দাস গুপ্ত নিজে রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট affidavit করেন যে ১৮৫৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কেদারনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালের গবর্ণমেণ্ট উহা স্বীকার করেন, এবং Service Bookএ পঁচিশ বৎসরের অধিককাল তাঁহার বয়স ঐরূপ ধরা হয়। ইদানীং তাঁহার উপরিস্থ রাজপুরুষগণ তাঁহাকে কিরূপে সরাইবেন তাহাই খুজিতেছিলেন; তাঁহারা ৩০ বৎসর পূর্ব্বের কাগজ পত্র খুজিয়া ও ৩৯ বৎসরের University Calendar

উদ্ঘাটন করিয়া, তাঁহার বয়স ইচ্ছানুসারে ঠিক করিয়া লইলেন ও পর-বর্ত্তী সংশোধন অগ্রাহ্য করিলেন। সুতরাং ৫৩ বৎসর বয়সেই কেদারনাথ রায় কার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন। ৫৫ বৎসর বয়সের পরও সুদক্ষ বিচারকগণ extension পাইয়া থাকেন; কেদারনাথ রায় extension চাহিয়া পাইলেন না। গবর্ণমেণ্টের এই অবিচার তাঁহার মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল। ৩২ বৎসর শরীর মনের সমুদয় শক্তি দিয়া, যে গবর্ণমেণ্টের জন্য খাটিলেন তাহাদের এই বিচার! গত ২১শে ডিসেম্বর, চাকুরীর শেষ দিনে স্মৃতিপুস্তকে লিখিতেছেন—"The best virtue of a Judge is independence and courage. His Majesty's Judge fears no body, not even the King. The principle must be preached even if we die for it. It will be transmitted to my children."

* * * * *

"I pray for the people of Birbhum among whom I have worked for nearly two years. Oh God, forgive me for any wrong I may have done them. Bless them with Thy grace. May there be no enemies here and may they all prosper. God, give me new light for new work."

তাঁহার কর্ম্মশীল জীবন নিশ্চেষ্ট থাকিবার নহে। ২২শে তারিখের প্রার্থনা এইরূপ—"Oh Merciful, give me peace and rest, open a new field for me and give me light and strength." ইহার কিছুদিন পরে লিখিয়াছেন—"Find nothing in which I can make myself useful." কিন্তু এই অবসাদের মধ্যেও অনেক কাজ হাতে লইয়াছিলেন। চিরকালই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবায়

আত্মোৎসর্গ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ ঋণগ্রস্ত, সিটীকলেজ ঋণগ্রস্ত। তিনি এই ঋণ পরিশোধার্থ আপনার শক্তি ও সময় নিয়োগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। লিখিয়া বা বক্তৃতা দিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবার শক্তি সকলের থাকেনা। কিন্তু যাঁহারা নীতি ও ধর্ম্মপ্রচার করেন, অর্থ, পরিশ্রম, সহানুভূতি ও সৎপরামর্শ দিয়া সেই সকল ব্যক্তি বা সমাজকে সাহায্য করিলেও গৌণভাবে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হয়। এভাবে তিনি চির-কালই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। এখন আরও একাগ্রতার সহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অথচ তাঁহার আদর্শ এত উচ্চ ছিল, তাঁহার খাটিবার আগ্রহ এত অধিক ছিল, যে নিজের প্রতি সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট থাকি-তেন। "My life has been a failure," একথা প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যাইত এবং কথাটি যখন বলিতেন, দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। অবসরপ্রাপ্তির পর ব্রাহ্মসমাজের যে বিভাগ হইতে যে কাজের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইত, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে সেই কার্য্যে মন দিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য বহুকাল হইতে ভগ্ন, কিন্তু তাঁহার শরীর কোন দিন তাঁহাকে কোন কাজ হইতে ফিরাইতে পারে নাই; তাঁহার মন তাঁহার ভগ্ন শরীর দিয়া সকলই করাইতে পারিত।

দেশহিতকর সকল অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল। গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য বলিয়া সকল সময়ে সকল কাজে যোগ দিতে পারিতেন না, কিন্তু রাজপুরুষদের নিকটও ন্যায়কে ন্যায় এবং অন্যায়কে অন্যায় বলিতে কখন ভীত হন নাই। Sir Bamfylde Fuller এর সঙ্গে একবার ঢাকায় দেখা করিতে যান এবং কথা প্রসঙ্গে বলেন, "If Your Hononr would allow me, I would advise Your Honour not to adopt repressive measures." Sir Bamffylde বলিলেন—"But Mr.

Roy, I am *human.*" Mr. Roy বলিলেন "A Lieutenant Governor ought to be more than human"

কেদারনাথের পরিশ্রমশীলতা ও অদম্য কার্য্যোৎসাহ তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। একদিন একঘণ্টা কেহ তাঁহাকে সময় নষ্ট করিতে দেখে নাই। সর্ব্বদাই কিছু না কিছু কাজ করিতেন, অথবা কাজের কথা ভাবিতেন, ভবিষ্যতের করণীয় কার্য্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া, স্থির করিয়া রাখিতেন। নিদ্রাকাল ভিন্ন তাঁহার চিন্তার বিরাম ছিল না। তাঁহার এমনই অভ্যাস ছিল যে, ছোট বড় কোন কাজই তিনি পরে করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না। এই জন্য, একটু দূরে গেলে, তাঁহার চিঠী, পত্র, তাকিদ ও টেলিগ্রাফে বাড়ী পূর্ণ হইত। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও যখন স্বাস্থ্যের জন্য চাকুরী লাভে বঞ্চিত হইলেন, তখন টেলিগ্রাফেই তাঁহার প্রায় হাজার টাকা খরচ হয়। সে সময়ে তিনি বিলাতের কত লোককে কত পত্র লিখিয়াছেন, এবং পুত্রকেই বা কত লিখিয়াছেন। মনে আছে, mail dayর পূর্ব্ব সন্ধ্যায় চিঠি লিখিতে বসিয়া ভোরে আসিয়া বিছানায় শুইয়াছেন। প্রতিবন্ধকতা চিরদিনই তাঁহার অধ্যবসায়কে দ্বিগুণ প্রবল করিয়াছে। তাঁহার অধ্যবসায়ের ফলে তিনি নিজে সামান্য শিক্ষকের পদ হইতে ক্রমে জেলার জজ হইয়াছেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র স্বাস্থ্যের ত্রুটিতে Civil Service হারাইলেও Provincial Service এ গৃহীত হইয়াছেন। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন', তাঁহার মন্ত্র ছিল। যাহা চাহিতেন তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত সংগ্রামে নিরস্ত হইতেন না।

নিজের অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও উচ্চাভিলাষ ছিল বটে, কিন্তু নিজের জন্য কিছুই করিতেন না। পরিবারের সুখ, পরিবারের, সমাজের বা দেশের গৌরব তাঁহার সকল চেষ্টার লক্ষ্য ছিল। এত উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু নিজ হাতে করিয়া নিজের জন্য কিছু ব্যয় করিতে পারি-

তেন না। আহার বিহার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য উদাসীনতা ছিল। তিনি নিজের পাদুকা বা পরিচ্ছদ কখন নিজে দেখিয়া শুনিয়া কিনিয়াছেন, বা করাইয়াছেন এরূপ দেখি নাই। জুতা ছিঁড়িয়া গেলে পুত্র বা পত্নী লক্ষ্য করিয়া আবার আনাইয়া দিয়াছেন। নূতন পরিচ্ছদ পাইলেই বলিয়াছেন, আমার এত কাপড়ের কি দরকার, ছেলেদের দাও। কিন্তু বাড়ীর লোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে এবং সুসজ্জিত হইলে আনন্দ অনুভব করিতেন। সন্তানদিগের সামান্য অভাব দেখিলে অসহ্য কষ্ট পাইতেন। আহারাদি সম্বন্ধে উদাসীনতা আরও বিস্ময়কর ছিল। সম্মুখে যাহা দেওয়া যাইত, সুস্বাদু হউক বা না হউক, বিনা বাক্যব্যয়ে নিঃশেষ করিতেন, অথচ কেহ যত্ন পূর্ব্বক খাওয়াইলে সন্তুষ্ট হইতেন এবং নিজে অতিথিকে ষোড়শোপচারে ভোজন করাইয়া সুখ বোধ করিতেন। অতিথি অভ্যাগতের প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল।

সাধ্যমত পরের উপকার করিয়াও তিনি মনে করিতেন পুত্রকন্যাদি ভিন্ন আর কাহারও জন্য কিছু করেন নাই। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ষোড়শ বৎসর বয়সে ধন জন গৃহ পরিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূন্য হস্তে পথে বাহির হইয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মের জন্য পরিণত বয়সে যথেষ্ট সময় ও শক্তি দান করিতে পারিলেন না বলিয়া সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন। অথচ ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহস্থের সকল কর্ত্তব্যই করিতেন। ব্রাহ্ম-সমাজ দরিদ্র, তাই ব্রহ্ম-সমাজকে ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্যার্থ অন্যূন ৫০০০৲ টাকা দিয়া যাইবেন, ৬ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ উইল করেন। ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পৈত্রিক জমদারীর নিজাংশ বিক্রয় করিয়া তিনি ২৪০০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীর নিকট এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির আয় তাঁহার পুত্র কন্যা যতদিন অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকে, কেবল ততদিন বা নিতান্ত প্রয়োজনীয় চাকুরী অথবা কোন ব্যবসায় গ্রহণ পর্য্যন্ত ভোগ করুক;

যখন সকলেই আপন জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইবে তখন সমুদয় সম্পত্তি ব্রাহ্মসমাজের হউক। পুরাতন উইল অগ্রাহ্য করিয়া, শেষ দিনে যে উইল লিখিতে বসিয়াছিলেন, তাহা শেষ হয় নাই এবং তাহাতে কাহাকে কি দিয়া যাইতেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তবে তাহার তৃতীয় para এইরূপ।

"Property I value, mainly, as a means of educating my children and settling them in life and, partly, as enabling my wife, children, and dependents to live in comfort and competence, in the sense of freedom from want, but not in luxury, and the surplus of the income from it, if any, should go to the benefit of the public and service of God. My executors should remember this wish and should try to administer my estate according to it with intelligence and wisdom."

ইহার পরেই উক্ত উইলে নিজের বহু দুঃখদারিদ্র্য-উৎসাহ অধ্যবসায় পূর্ণ জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাও শেষ হয় নাই। সেই দিন অপরাহ্ণে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বামী পত্নীর স্বাস্থ্য শোধনের জন্য তাঁহাকে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করাইতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বুঝি জ্ঞাতসারে স্বজনবর্গের নিকট বিদায় লইতে তাঁহার কোমল স্নেহময় প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিত, বুঝি শিশুসন্তানদিগের অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া বড়ই ভীত হইতেন, তাই মৃত্যু অতর্কিতভাবে তাঁহাকে ছিনিয়া লইল। ষোড়শ বর্ষ হইতে প্রায় চুয়ান্ন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যিনি আলস্য বা বিশ্রাম জানেন নাই, কর্ত্তব্যের পদে যিনি প্রতি মূহূর্ত্ত আত্মসুখ বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, অতিশয় স্নেহ যাঁহার পারিবারিক জীবন দুঃখময় করিয়াছিল, যিনি প্রতিদিন ভক্তি ও ব্যাকুলতার সহিত ভগবানকে

ডাকিতেন, ভগবান তাঁহার সকল দুঃখ কষ্ট রোগ শোক ভয় ভাবনার অবসান করিয়াছেন। তিনি সকলের সেবা করিয়া গেলেন, কাহারও সেবা লইবার অবসর পাইলেন না, যাহারা পড়িয়া রহিল, ইহাই তাহাদিগের বিশেষ ক্ষোভ।

৪২ হাজরা রোড,
বালীগঞ্জ, কলিকাতা
৯ই নবেম্বর, ১৯০৯